KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2067	Place of Publication 25/2 মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher সৌরীন্দ্রনাথ দাস
Title শনিবারের চিঠি	Size 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol. & Number : ১৮/১০ ১৮/১১ ১৮/১২	Year of Publication : শ্রাবণ, ১৩৫৩ ভাদ্র, ১৩৫৩ আশ্বিন, ১৩৫৩
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : সজনীকান্ত দাস	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

শনিবারের চিঠি

শারদীয়া সংখ্যা—আশ্বিন : মূল্য বারো আ
PUJA SPECIAL—SEPTEMBER : Price 12 A

সম্পাদক :
শ্রীসজনীকান্ত দাস

স্নানযাত্রা

কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্টস :

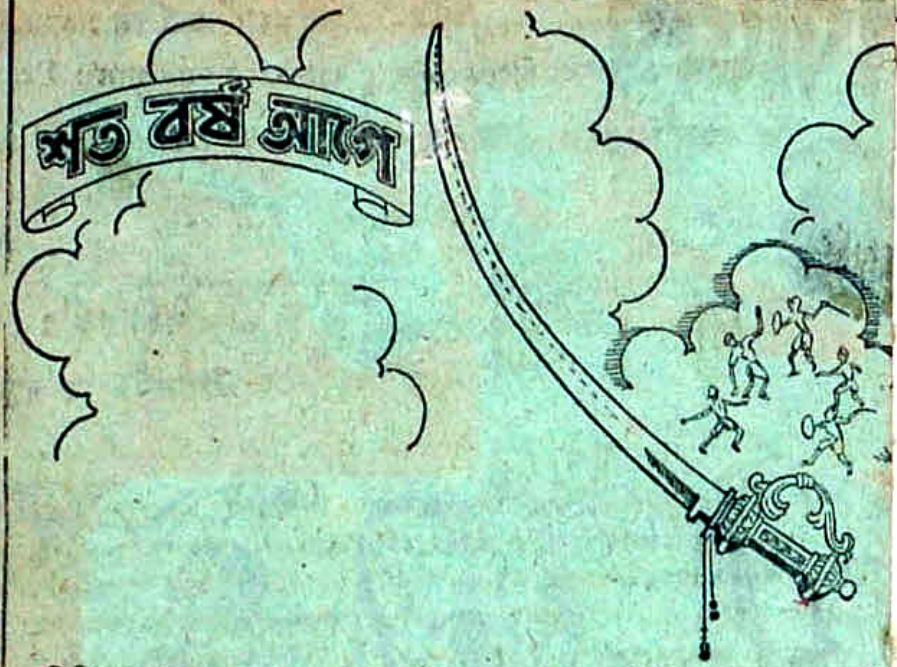

নিরীহের রক্তে লেখা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের ইতিহাস—অত্যাচারী বিদেশী বণিক-শাসকের হাত থেকে ভারতের নরনারী চেয়েছিল মুক্তি—চেয়েছিল স্বাধীনতা। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের আগুন একদিন বাংলার বারাকপুর থেকে আগ্নেয়গিরির লাক্ষাস্রাবের মত প্রবাহিত হ'য়ে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেললো সেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যর্থ-গৌরবের ইতিহাস দিয়ে রচা আমাদের নবতম রেকর্ড-নাট্য

—শতবর্ষ আগে—

(N 27640 to N 27647)

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

শ্রেষ্ঠ শিল্পী ★ নিখুঁত রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ

দমদম বম্বে—মাদ্রাজ—দিল্লী—লাহোর

VR23

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জেমস জিন্‌স-এর
দি মিস্‌টিরিয়স ইউনিভার্স্‌-এর সরল অনুবাদ

বিশ্ব-রহস্য

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও অকিঞ্চিৎকরতায় দেশের বৃহত্তম অংশ আজ মূঢ়তার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার চিন্তায় এসেছে এক সর্বনেশে জড়তা, তাই আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সে আজ অপাঙ্‌ক্তেয়। এই চরম দুর্গতি থেকে তাকে মুক্ত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন মাতৃভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণের উপযোগী করে লেখা স্যর জেমস জিন্‌সের বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করার ভার আমরা গ্রহণ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যথোচিত সরল করে তা সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দিতে জিন্‌সের দক্ষতা অপরিসীম। তিনি শুধু যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তা নয়, ভাষাপ্রয়োগেও অসাধারণ নিপুণ; সহজ ও সরল ভাষায় জটিল বিষয়কে সুসহ করে তিনি উচ্চতন স্তরের দান নিম্নতন স্তরের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। গ্রহলোক ও প্রাণলোক সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য নিয়ে আরম্ভ করে বস্তু ও বিকিরণের প্রকৃতি ও পরস্পর সম্বন্ধ, নক্ষত্র-জগতের দেশকালের বিরাট পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতার বিস্ময়কর রহস্যের কথা জিন্‌স এই গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব সমস্যা স্বভাবতই আগ্রহের সঞ্চার করে ও চরম দার্শনিক আলোচনার অঙ্গীভূত বলে জিন্‌স মনে করেছেন তাদেরই আলোচনা করা হয়েছে প্রথম চারটি অধ্যায়ে। শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের, গ্রন্থে আলোচ্য বিভিন্ন তথ্য ও মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর আপন মত তিনি অসংকোচে প্রচার করেছেন।

এই বইটি অনুবাদ করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞানে ভূতপূর্ব অধ্যাপক। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তাঁর দক্ষতা আছে; 'বিশ্ব-পরিচয়', 'পৃথ্বি পরিচয়', ও 'নক্ষত্রপরিচয়' গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েছি। দুরূহ বাক্যজালে বিষয়বস্তুকে ক্ষুণ্ণ করে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, ভাষাপ্রয়োগে তাঁর নিপুণতা আছে, নির্মমতা নেই। সচিত্র, সুন্দর গঠনপরিপাট্য, ৩৲

প্রকাশক—সিগ্‌নেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচী

আশ্বিন ১৩৫৩

শক্তি-পূজা	৩৯১	মহাম্ববির জাতক—"মহাম্ববির"	৪৫৬
সমাধান—শ্রীঅমলা দেবী	৪০৭	বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট—শ্রীবিরূপাক্ষ	৪৭১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪১	পঞ্চকন্যা—শ্রীমতী বাণী রায়	৪৭৫
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৮	শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী	৪৮০
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল	৪৫৪	নেলীর বাবার ডায়েরি —শ্রীসুকুমার রায়	৪৯০
		সংবাদ-সাহিত্য	৫০১

শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸০ ও ষাণ্মাসিক ২৷৵০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৵০ ও ২৷৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩৷৷০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১০ ; ভি. পি.তে ৷৵০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাঁদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জন্‌সন্‌ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগাযোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য!"

প্রেরণার উৎস **চা**

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IX 266

১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৩

শক্তি-পূজা

গত পনরোই সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী 'কর্তব্য কি' শীর্ষক নিবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন, গুণ্ডাদের দ্বারা কাহারও ধনসম্পত্তি প্রাণ অথবা নারীরা আক্রান্ত হইলে অহিংস প্রতিরোধ সর্বোত্তম উপায়, "retaliation or resistance unto death is the second best"। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতার বিশুদ্ধ বাতাস যাহারা পান করিতে চায়, তাহারা পুলিস বা মিলিটারির সাহায্য না লইবার জন্ত নিজেদের অবশ্যই ইস্পাত-কঠিন করিয়া তুলিবে। নিজ নিজ সক্ষম বাহুর উপর তাহাদিগকে বরাবরই নির্ভর করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর ত্রিশ বৎসরের শিক্ষা ও প্রভাব সত্ত্বেও আমরা এখনও জাতিগতভাবে সর্বোত্তম পথের পথিক হইতে পারি নাই। এই রূঢ় সত্য স্বয়ং গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় পথের পন্থীও আমরা ছিলাম না। থাকিলে আমাদের দীর্ঘ হাজার বৎসরের ইতিহাস কেবল পীড়ন লাঞ্ছনা, ক্ষয় ও ক্ষতির ইতিহাস মাত্র হইত না, অসহায় মানুষের সভয় আর্তনাদে দেশের আকাশ বারংবার মথিত বিদীর্ণ হইত না। আমরা বহুকাল ধরিয়া শিথিল ভাবে শক্তি-পূজার ভান মাত্র করিয়া আসিয়াছি, কাপুরুষের পূজা দেবী গ্রহণ করেন নাই।

এইবার আমরা যে কারণেই হউক, কাপুরুষতার গ্লানিমুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি। সত্যকার শক্তি-পূজার কাল আসন্ন। গান্ধীজী-বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদালাভ করিয়া আমরা প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী গুণ্ডাপ্রকৃতির দুষ্কৃতদের বিরুদ্ধে আমরণ প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্প করিতেছি, তাহাদিগকে সজ্ঞানে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রতিশোধও লইব। দেশের শাসনতন্ত্র এখনও আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের, অনুকূলে আসে নাই। আপৎকালে পুলিস-বিভাগের অথবা সামরিক-বিভাগের সহায়তা যে আমরা পাই না, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তির হইয়াছে। অনেকে বিপরীত অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়াছেন। পুলিস ও সামরিক বিভাগ বহুক্ষেত্রে গৃহস্থের উৎপীড়ন-লাঞ্ছনার কাজে গুণ্ডাদের সহায় হইয়াছে, বাংলা দেশের শহরে মফস্বলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গুণ্ডাদের দ্বারা সুপরিকল্পিত এবং সুঅনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা ও লুণ্ঠন এমন অতর্কিত ভাবে আসিয়াছিল যে, গৃহস্থ ব্যক্তিরা প্রথমটা ধনপ্রাণ রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করিতে

পারে নাই, পরে মহল্লায় মহল্লায় সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। যতদূর সম্ভব বলিলাম এই জন্য যে, বেপাড়ায় অতর্কিত আক্রমণ অথবা ট্রামে বাসে সম্মিলিত আক্রমণ রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নাই, পুলিস ও মিলিটারির সাহায্য ব্যতিরেকে একা একা আত্মরক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ কাজের অর্থাৎ উদরের চাপে অনেককেই গুণ্ডা-অধ্যুষিত স্থানে অথবা স্থান দিয়া একা একা যাইতে হয়। এসব ক্ষেত্রেও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়া গুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ-আক্রমণ বন্ধ করা একদিনে না হউক, দশ দিনে যাইত; কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নামে অথবা সম্প্রতি-জারিকৃত এমার্জেন্সি আইন বা হুকুমের জোরে আমাদের তথাকথিত রক্ষাকর্তারা সে ব্যবস্থা আমাদের করিতে দিবে না। সেদিক দিয়া আমাদের বিপদ সম্পূর্ণ থাকিয়াই যাইতেছে। কিন্তু আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া মহল্লায় মহল্লায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আইন মানা উচ্চ-নীচ সকল স্তরের ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় গুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সম্পূর্ণ রোধ করা যাইতে পারে।

গুণ্ডা বলিতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুঝায়। সুবিধা পাইলে পুলিস ও মিলিটারিরাও কেহ কেহ অনেক ক্ষেত্রে গুণ্ডামি করিয়া থাকে। গুণ্ডা-আইন প্রবর্তনের সময় পশ্চিমভারতীয় একটি প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমান সদস্যেরা পরিষৎ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বসমাজের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন আমরা এরূপই মনে করি। আগে গুণ্ডারা হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকনির্বিশেষে গুণ্ডামি করিত, সম্প্রতি স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের কূটকৌশলে গুণ্ডারাও সাম্প্রদায়িক মাহাত্ম্য অর্জন করিয়া স্বসম্প্রদায়ের ভদ্রলোকদেরও আত্মীয় ও আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ ফল ভয়াবহ, পাপে চলিতে চলিতে ইহারা স্বভাববশে ঘাড়ে চড়িবেই, তখন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের দোহাই পাড়িয়া ইহাদের সর্বনাশা কবল হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না। কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কুফলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই অবিলম্বে সাবধান হইতে হইবে, উত্তপ্ত তাওয়া অপেক্ষা প্রজ্বলন্ত অগ্নি কখনই সুখকর নয়।

আমাদের নিজেদের দোষে আমরা সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের বাংলা দেশে অত্যাচারী-উৎপীড়করূপে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ দিয়াছি। আমাদের দৈহিক ও মানসিক কাপুরুষতা-দুর্বলতার জন্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া আমরা তাঁহাদের বেআইনী আবদারকে দাবির অধিকার দিয়াছি, আস্কারা পাইয়া পাইয়া তিল তাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অসহ্য হইলেও বহুদিনের অভ্যাসবশে আমরা আজ বাধা দিতে পারিতেছি না। অনেক দিনের দাবির জোরে মুসলমানেরাও বিভ্রান্ত

হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যায়কে ন্যায় এবং ব্যাধিকে স্বাস্থ্য বলিয়া ভুল করিতেছেন। এই ভুল ভাঙিবার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই তাঁহারাও জবরদস্তি সঙ্কোচ করিতে করিতে সুস্থ হইয়া উঠিবেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূলোচ্ছেদ আপনা হইতেই হইবে।

জানি, মুসলমান বন্ধুদের এই সহজ সত্যটি আজ ভাল লাগিবে না; কিন্তু তাঁহাদিগকে সামান্য কয়েকটি ব্যাপার স্মরণ করিতে বলি। মসজিদের সন্নিকটে বাজনা বন্ধ করিবার অথবা প্রকাশ্য স্থানে গো-কোরবানির দাবির মামুলী দৃষ্টান্ত দিব না। আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সেগুলি আকারে অতি ছোট, তিল মাত্র। এই তিলই তিলে তিলে পর্বতপ্রমাণ হয়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সম্পূর্ণ হিন্দু মহল্লায় অনেক দিন দ্বিপ্রহরে মুসলমান বালকেরা কোনও গৃহের দাওয়া বা রক অধিকার করিয়া তাস বা অন্যবিধ জুয়া খেলিতে বসে। তাহারা সে সময় পরস্পর সম্বোধনে যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেক গৃহস্থই তাহা পুত্রকন্যাদের শুনিতে দিতে চাহেন না। কিন্তু তাহাদিগকে সরাইয়া দিতে গেলে তাহারা রুখিয়া উঠে, শাসায় ও হল্লা জুড়িয়া দেয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আকার লইতে বিলম্ব ঘটে না। তাহাতে অনেক ফ্যাসাদ, সুতরাং বহু গৃহস্থ চুপ করিয়া যান। এই উপেক্ষায় দাবির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে অনেককে পাড়া ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। মুসলমান-মহল্লার সন্নিকটে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই বৎসরে বৎসরে মহরমের চাঁদার আবেদন কি আকারে আসে তাহা সভয়ে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও দিতে হয়, কারণ বিপদের কল্পনা অনেক দিক হইতেই আসে। মুসলমানের কাছে দুর্গাপূজার চাঁদার দাবি কৌতুকচ্ছলেও আমরা করিতে পারি না। ফুটবল খেলার মাঠে যাইবার দুর্ভাগ্য যাঁহাদের আছে, মহামেডান স্পোর্টিঙের কোনও খেলায় দর্শকরূপে তাঁহাদের শ্রবণ ও চক্ষুগত অভিজ্ঞতা যদি তাঁহারা বর্ণনা করেন, তাহা হইলে পুলিসে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। মানবীয় ভাষা এবং ভঙ্গী যে কত কদর্য হইতে পারে, সেখানে না গেলে কেহ উপলব্ধি করিবেন না। ওইদিন ট্রামে বাসে মাঠে গমন-প্রত্যাগমনের অভিজ্ঞতাও ভয়াবহ। নিরুপায়ভাবে এ সকলই আমরা সহ্য করিয়া যাই। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু বিস্তার করিয়া লাভ নাই। আমাদের সহ্যগুণের চরম পরীক্ষা লওয়া হয় আমাদের মেয়েদের প্রসঙ্গে। পথে ঘাটে পার্কে সমবেতভাবে ইহারা যে কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহাতে নিতান্ত কেঁচোর রক্ত বলিয়াই আমরা ঠাণ্ডা থাকিয়া যাই।

মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি একেবারেই দোষ দিতেছি না। অসভ্য ইতর সকল সমাজেই আছে। ভদ্র শিক্ষিত মুসলমানেরা নিশ্চয়ই এই জাতীয় নির্লজ্জতায় ও

ইতরতায় লজ্জা অনুভব করেন। আমরা সহ্য না করিলেই তাঁহারা খুশি হইতেন। আমরা সহ্য করি কেন? সহ্য করি, ইহাদের মামলাও বৃহত্তর মুসলমান-সমাজ অকস্মাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া। সঙ্ঘবদ্ধ হইবার, নির্বিচারে সাধারণ ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক আকার দিবার অতিশয় প্রশংসনীয় ক্ষমতা মুসলমানদের আছে। আমাদের তাহা নাই, সুতরাং আমরা অপমান ও বেইজ্জতি পকেটস্থ করিয়া কাঁচুমাচু মুখে সরিয়া পড়ি। ইহাতে আমাদের ক্ষতি তো হয়ই, মুসলমান-সমাজও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের একান্ত অক্ষমতাজনিত প্রশ্রয়ের ফলে এই সকল পুঞ্জ পুঞ্জ সামান্য ঘটনা-ফেনা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া তুচ্ছ আবদার-উপেক্ষাকে অসামান্য রাষ্ট্রীয় অধিকারের রূপ দিয়াছে। আজ আর 'না' বলিবার উপায় নাই।

অতর্কিতে মাথায় একটু বেশি রকমের ঘা খাইয়া এবার আমাদের দীর্ঘকালের জড়তা কিঞ্চিৎ চিড় খাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতার দাঙ্গার পর হিন্দু একবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, স্মরণ হইতেছে। সেই উত্তেজনার মুখে আমরাও লিখিয়াছিলাম :—

"হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না কেন, প্রয়োজন হইলে শুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টাই বা সে না করিবে কেন? তোমরা সুবিধা পাইলেই নিরীহ হিন্দুনারীকে ধর্ষণ করিয়া হিন্দু-সমাজের অবমাননা ও লোকক্ষয় করিবে, শক্তিহীনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিয়া মিথ্যা নমাজের দোহাই দিয়া যখন তখন হিন্দুর রক্ত দেখিয়া ছাড়িবে, হিন্দু আজ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তোমার এই অত্যাচারের প্রতিকার সাধনে চেষ্টিত হয় তাহা হইলে অন্যায় কোথায়? তুমি মারিবে আর আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, এ তোমার কেমনতর বিচার? তাহা ছাড়া, পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখিতে পাই, সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার এক প্রচণ্ড প্রয়াস আছে। খ্রীষ্টিয়ানের মিশনরি আছে, বুদ্ধের শ্রমণ ও ভিক্ষু ছিল, তোমার মোল্লা আছে, আর হিন্দু অন্যধর্মাবলম্বীকে বা ধর্মান্তরগ্রহণকারীকে স্বধর্মে আনিবার চেষ্টা করিলেই তাহার দোষ হইল, ইহা কিরূপ যুক্তি?

বুদ্ধিমান জীবকে যুক্তি দিয়া বুঝানো যায়, কিন্তু যেখানে যুক্তির পরিবর্তে লগুড় উঠিবে, সেখানকার একমাত্র ন্যায়যুক্তি লগুড় ছাড়া কিছুই নয়। হিন্দু যে এতকাল অত্যাচারের পরও ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটাছুটি করিতেছে না ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু মুসলমানের এমন অহেতুক অযৌক্তিক অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা যদি মসজিদ ভাঙিতে কিংবা মন্দিরে পরিবর্তিত করিতে শুরু করে, মুসলমানকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু করিয়া লয়, মুসলমান নারীকে ধর্ষণ করে, তাহা হইলে কি ভাল হইবে? কলসির কানার মার খাইয়া খাইয়া হিন্দু কি চিরকালই প্রেম দিবে? প্রেম করিবার পাত্রও তো উপযুক্ত হওয়া চাই।

মুসলমান নেতারা আজ আপাতমধুর ফল পাইয়া নৃত্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কালের ভবিষ্যৎ বিচারের কথা তাঁহারা ভাবিলেন না। আজিকার শারীরিক সামর্থ্যের জন্য জয়োল্লাস কয়দিন টিকিবে? হিন্দু মার খাইয়া খাইয়া আজ মাথা তুলিতেছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবেই। তাহারা মারের পরিবর্তে মার দিবে, মুসলমানকে হিন্দু করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে সবে তাহারা শুরু করিয়াছে। সামাজিক অনেক পঙ্কিলতা মুসলমানের সহিত বিরোধিতায় ধুইয়া যাইবে, তখন মুসলমান টিকিবে কোথায়? মুসলমান যদি আজও আত্মস্থ না হয়, তাহা হইলে লম্বা দৌড়ে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।...

গত এপ্রিল মাস [১৯২৬] হইতে পর পর যে কয়েকটি দাঙ্গা বাংলার উপর হইয়া গেল, তাহাতে হিন্দু এই বুঝিয়াছে যে, ক্ষমা ও প্রেম নিরীহের মহত্ত্ব নহে, দুর্বলতামাত্র। হিন্দু যদি সবল হইত, ঠেঙানির উত্তর যদি ঠেঙানি দিয়া সে দিতে পারিত, তাহা হইলে প্রীতি-মৈত্রীর কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত না বটে, কিন্তু এখন যখন মার খাইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তখন প্রীতির বার্তা প্রচণ্ড উপহাস ছাড়া কিছুই নয়। মরণাপন্ন রোগীকে পোলাও-কালিয়ার কথা বলা যেরূপ হাস্যজনক, বিপন্ন দুস্থ অত্যাচারিত নিরীহ হিন্দুকে যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যদেবের চ্যালা করিয়া তোলাও তেমনই হাস্যকর।

আশ্চর্য এই মুসলমান নেতাদের একনিষ্ঠ ধর্মপ্রীতি দেখিয়াও হিন্দুনেতাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। সাধারণ মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজে যে তাঁহাদের সক্রিয় সহানুভূতি আছে, ইহা আমরা সর্বদা দেখিতেছি। ন্যায়-অন্যায় বিচার ইঁহারা করেন না, তাঁহারা দেখেন, মুসলমান ইহা করিয়াছে সুতরাং সমর্থনযোগ্য। হিন্দু নেতারা ইঁহাদের আদর্শে কবে অনুপ্রাণিত হইবেন?

ভারতের হিন্দুর অবমাননা ও লোকক্ষয় রোগের একমাত্র প্রতিকার শুদ্ধি আন্দোলন ও সংগঠন। হিন্দু দলবদ্ধ হউক। প্রাণ দিয়া মান রক্ষা করুক। যদি তাহারা বীরের মত মরিতে প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে অলক্ষ্যে ছুরি খাইয়া মরিতে হইবে। যদি মৃতপ্রায় এই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তুমি আমি প্রত্যেকেই না করি, তাহা হইলে সকলেরই মুসলমান হইয়া গিয়া অকারণ গৃহবিবাদ হইতে দেশকে রক্ষা করা কর্তব্য।

অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানিত, বাহিরে আসিবার মন্ত্র শিখে নাই বলিয়া প্রাণ হারাইল। হিন্দুসমাজ বাহিরে আসিবার মন্ত্র জানে, ভিতরে প্রবেশ করিতে জানে না বলিয়াই এমন হীনবল ও লাঞ্ছিত হইতেছে। বহির্গত হিন্দুকে স্বসমাজগোষ্ঠীতে ফিরাইয়া আনিবার উপায় শুদ্ধি ও সঙ্ঘবদ্ধতা। এখন হইতে তাহা না করিলে আমরা আত্মহত্যার পাতকী হইব।"—১৯ আশ্বিন ১৩৩৩

ইহা পুরা বিশ বৎসর পূর্বের কথা এবং রাগের কথাও বটে। বর্তমানে আমরা এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও সেদিন বর্তমান হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। আজ তাহাও আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গম গম করিতে থাকে,—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এইই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানোই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল সে তো কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এ দেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাইই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এই জন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ, কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, সময়মত একটা ছাড় রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ

আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবির বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কির শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণ বধ করিয়া গেল। বস্তুত এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষু কর্ণ, কেহ বা আর কিছু,— হায় রে! এতবড় তামাসার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না। সে যাত্রা কোন মন্ত্রে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি।

ইহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কল্‌মা পড়াইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী, দ্বিধা হও।

বস্তুত, মুসলমান যদি কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের 'পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনও সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উঁহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে যে, নিরাপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উঁহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করিবে না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বেশি তারতম্য নাই, কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ে তুলনাই হয় না, হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদ-পত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি; সময় এবং সুযোগ পেলে···

মিলন হয় সমানে সমানে, শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি

তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না, এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় তো সে এখন থাক্। মানুষের অন্য কাজ আছে, খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে এ দুরাশা দুই-একজনার হয়তো ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না, তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন, দুঃখদুর্দশার মত শিক্ষক তো আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়তো তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়তো হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজ-রথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষা-সাপেক্ষ, যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না, এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশ-কুসুমের লোভে আত্ম-বঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ওই গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাংলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাত পুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে, সুতরাং রক্তসম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি, জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও পিতা, কাহারও বা পিতামহ, কেহ বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই-বোন নন। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এত বড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে, এমনিই বটে! উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে,

হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন, এবং হিন্দু-ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না,—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ-গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে, যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যেই গণ্য করে না।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা অনেকের কানেই হয়তো তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপূত হইবে না। আবার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে তো এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরও কোন সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাহিনে বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারম্বার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে, জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি, তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার

মহিলাকে হরণ করিলে,— এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি; এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর স্থিতিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হৌক, মিলন করিবার ভার আমাদের, এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুত, হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেরা এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন, যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে; যখন বুঝিবে, যে কোন ধর্মই হৌক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝায় এখনও অনেক বিলম্ব, এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোন দিন চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না, ইহা সম্ভব, না, তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে তো ইংরাজের পক্ষেই ছিল? আয়র্লণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গবর্মেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ তো গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই তাহার সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে, যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়তো একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"

আগষ্ট নরমেধযজ্ঞের পরে আমাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। মুসলমানদের সহিত যদি আমরা সত্যকার মিলন চাই, তাহা হইলে আত্মশক্তির ভিত্তিতেই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, মনপ্রাণ দিয়া শক্তি-পূজা করিতে হইবে। অক্ষমের মত অসহায়ের মত, ছোটখাট অন্যায় সহ্য করিয়া করিয়া যে প্রশ্রয় আমরা দিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কোনও পক্ষেরই মঙ্গল হয় নাই। বৃহৎ মিলনের খাতিরে আমাদিগকে অনেক কিছু ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কিন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপারে দুর্বলতা দেখাইয়া ভয়জনিত প্রশ্রয় দিয়া আমরা যেন পুনরায় দেশের সর্বনাশ না ডাকিয়া আনি।

শক্তি-পূজার মূল কথা নারীর সম্মান। যে দেশে নারীর সম্মান পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়, সে দেশে শক্তি-পূজা বিফল ও অসার্থক। দুর্বল কাপুরুষেরাই নারীর সম্মান রাখিতে পারে না। আমরাও পারি নাই, তাই আমাদের শক্তি-পূজা ভানমাত্র হইয়াছে, অথচ নিতান্ত ইতর এবং হীন মনোবৃত্তি লইয়া গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারীদের আমরা সামাজিক নিগ্রহ করিতেও কসুর করি নাই। এইখানে আমাদের পাপ চার পোয়া হইয়া আমাদিগকে অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। সেদিনের এত রক্তপাত এবং লোকক্ষয় যদি এই দিকে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে, তবেই অশিবের মধ্যে শিবের মঙ্গলহস্ত আমরা দেখিতে পাইব।

নারী লাঞ্ছন ধর্ষণ ও হরণ বাংলা দেশের একটি ব্যাপক ও বৃহৎ সমস্যা। ইহা নিছক গুণ্ডাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও নিতান্ত থানা-পুলিস-আদালতেই এই সমস্যার চরম মীমাংসা হয় না। ধর্ষিত ও অপহৃত হিন্দুনারীদের বেলায় সর্বত্র শেষ পর্যন্ত ইহা সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই সামাজিক কারণে অনেক ক্ষেত্রে আদালত পর্যন্ত আমরা এই লাঞ্ছনার জের টানিতে চাই না, ফলে দুষ্কৃতকারীরা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কলিকাতায় নর ও নারী মেধযজ্ঞের নারী অংশের রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত আছে। কানাঘুষায় যাহা শুনিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণটাই গুজব নয়, কারণ সংবাদপত্রে পশ্চিম-ভারতের কোনও কোনও স্থানে মুসলমান গুণ্ডার সহিত কলিকাতা হইতে অপহৃত হিন্দুনারীর অবস্থান-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার কোনও কোনও অঞ্চলে পরিত্যক্ত গৃহ হইতে ধর্ষিত হিন্দুনারীদের উদ্ধার করা হইয়াছে। মফস্বল হইতেও প্রতিদিন নারীহরণের সংবাদ আসিতেছে। লজ্জার সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রকাশ্যভাবে এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধান ও বিচার দাবি করিতে হইবে। পুরুষজাতির অক্ষমতার অপরাধে যে সকল নারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, সামাজিকভাবে তাঁহাদের গায়ে যেন কোনও কলঙ্কের দাগ না লাগে—আমাদের সামাজিক মনোবৃত্তি এমন ভাবে গড়িয়া

তুলিতে হইবে। কোন্ কোন্ পল্লীর কোন্ কোন্ বাড়ির কোন্ কোন্ নারী অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিতে আমাদের বাধিবে না। আমাদের সমাজপতিদের অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির জন্য আমরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া অপমানিত ধর্ষিত ও অপহৃত নারীদের বর্জন করিয়া সামাজিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। অপরপক্ষে ইহাদের লইয়াই মুসলমানেরা ধীরে ধীরে সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে। এই নারীদের এবং ইহাদের অক্ষম অভিভাবকদের এই কথাই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা অনিচ্ছায় লাঞ্ছিত হইলে কোনও নারী পতিত হয় না। শাস্ত্রবিধি অনুসারেই তাহার সামাজিক দাবি সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

এই আত্মবিনাশের পাপ বর্জন করিয়াই আমাদিগকে এবার শক্তি-পূজায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত নারীদের নিজেরা সামাজিক-ভাবে লাঞ্ছনা করিয়া আমরা হীনতর পাপ করিয়া আসিতেছিলাম, এই পাপের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তবেই আমরা শক্তির ভজনা করিব। শক্তি অর্জিত হইলে ভবিষ্যৎলাঞ্ছনার ভয় বিদূরিত হইবে, যাহা হারাইয়াছে তাহাকে সম্মানের সহিত ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে সর্বদা হারাই-হারাই ভয়ে আমরা আর মূর্ছিত থাকিব না। আমাদের অনেক বিপদ কাটিয়া যাইবে। দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

এ বিষয়ে দেশের অবিবাহিত যুবক সম্প্রদায়ের একটা বিরাট কর্তব্য আছে। ইহা তাঁহাদিগকে নানাভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। সমাজের নেতারা এ বিষয়ে মুহুর্মুহু ফতোয়া জারি করিলে লুপ্ত সমাজচৈতন্য পুনর্জাগ্রত হইবে। আমাদের এবং বিশেষভাবে তাঁহাদের অক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তার দরুন এই জাতীয় যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহারাই প্রধানত তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আমরা অর্থাৎ অভিভাবক সম্প্রদায় প্রায়শ্চিত্ত করিব অপহৃতা ও লাঞ্ছিতাদের সমাজে সসম্মানে স্থান দিয়া।

যত মাথা তত মত—হিন্দু বাঙালীর এই একটা অপবাদ আছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, প্রবাসে বাঙালী যেখানে যেখানে পাকা ডেরা বাঁধিয়াছে, সেইখানেই পরস্পর দলাদলি ও বিরোধের অন্ত নাই। সামান্য অভিনয়ের ভূমিকা বিলি লইয়া অথবা বই বাছাই লইয়া খুনাখুনি পর্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। অপরপক্ষ আমাদের এই দুর্বলতার কথা ভালই জানে এবং সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাহারা চোখ রাঙায়। এই দুর্বলতা সর্বাগ্রে দূর না হইলে আমরা কোনও দিনই নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিব না, বরাবর মার খাইতে থাকিব। অবাঙালী অন্য হিন্দু-সম্প্রদায়কেও প্রীতি ও সম্মানের চোখে দেখার অভ্যাস আমরা অনেক দিনই হারাইয়াছি। ইহাও আমাদের শক্তিহীনতার অপর একটি কারণ। আধুনিক সভ্যতার বিচারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যখন তমসাবৃত ছিল, তখন বাংলা

দেশ কতক বৈষয়িক প্রয়োজনে এবং খানিকটা নূতনত্বের মাদকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। "ইয়ং বেঙ্গল" নামে প্রসিদ্ধ সেদিনকার বাঙালীর ক্লেশকর সাধনার ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, পূর্ণ এক শতাব্দীর সিদ্ধিলাভকে তাঁহারা আকস্মিক বিবেচনা করিবেন না। নূতনের বীজ যাহারা বপন করিয়াছিল, নূতন ফসল তাহারাই ন্যায়ানুমোদিত ভাবেই পাইয়াছিল। নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানের মত্ততায় বাঙালী সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরেজের দালালরূপে জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিল। সূত্রপাতে যাহা তাহার নিকটে শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবহারে দেখা গেল, তাহাই তাহার চরমতম দুর্বলতার আকর হইয়া উঠিয়াছে; বাঙালী স্বদেশে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ নগর ও তীর্থস্থানগুলিতে কলিকাতার আদর্শে চৌরঙ্গী, পার্ক ষ্ট্রীট, গ্রেট ঈষ্টার্ন ও গ্র্যাণ্ড হোটেল পত্তন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহাতী সম্প্রদায়ের যে অপরিসীম বিস্ময় বাঙালী উদ্রেক করিয়াছিল, বহুকাল পরে ঘুম হইতে সদ্য জাগিয়া তাহারাই ওই সকল পরম বিস্ময়কর পদার্থকে ঈর্ষার চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। সেই ঈর্ষা-সিন্ধুমন্থনসঞ্জাত হলাহলের দ্বারা বাঙালীর সমৃদ্ধি আজ ঘরে ও বাহিরে সর্বত্র জর্জরিত। যাহাদের ঘুম ভাঙানোর কাজে বাঙালী একদিন হয়তো লাভের লোভে কিংবা নিছক খোশখেয়ালে ভৈরবীসুর ভাঁজিয়াছিল, তাহারাই যে আজ অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে প্রতিহিংসার বশে তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহাতে অবাক হইলে চলিবে না। ইহাই হয়, কারণ ইহাই স্বাভাবিক। ইংরেজ আমাদের অন্ধকার যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক আনিয়াছিল বলিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞবোধ করিলেও আমরা বাহিরে "কুইট ইণ্ডিয়া"র ধুয়া ছাড়িতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, যাহা ঘটিয়াছে, বাঙালীর পক্ষে বাংলার বাহিরে তাহাই ঘটিয়াছে। অবশ্য নাক-উঁচু বাঙালীর প্রেমহীন অবহেলা ইহার জন্য কতখানি দায়ী, আজ কে তাহার বিচার করিবে?

ব্যাধির বীজ রক্তে প্রবেশ করিয়াছে, কারণ বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া লাভ নাই। প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেই আমাদের অশেষ কল্যাণ। ইংরেজের অর্থাৎ বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধের মূলে যে এক্সপ্লয়টেশনের গ্লানি, বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীর সহিত অবাঙালীর বিরোধের মূলেও অনুরূপ গ্লানি বর্তমান। এই গ্লানির ফলেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালী-পীড়নযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহাতে ঘাবড়াইলেও চলিবে না।

কারণ, আজ আমরা মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি, এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে বৃহত্তর বিপদের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে। সে বিপদ আমাদের ঘরে একেবারে

আমাদের মর্মস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে এবং গত ১৬ই আগষ্ট তারিখ হইতে আমরা তাহারই বিচিত্র প্রকাশ দেখিতেছি। বাঙালী হিন্দুর সহিত বাংলা দেশের মুসলমানের যে বিরোধ তাহা আজ শুধু ধর্মগত নয়, কূটকৌশলী নেতাদের নানা চালে তাহা পলিটিকাল বিরোধে দাঁড়াইয়াছে এবং কোয়াদে আজম জিন্নার "দুই জাতিতত্ত্বে"র মোহে পড়িয়া এই বিরোধ জাতিগত বিরোধ হইয়া উঠিতে আর দেরি নাই। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতিগত পার্থক্যের ধুয়া তুলিয়া দুই সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। বিরোধ এবং সংঘর্ষ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অভিযান দৃষ্টে যে অবস্থার কথা মনে হয়, তাহাতে আজ আমরা কল্পনাই করিতে পারিতেছি না যে, কোনও দিন আমরা নিরুপদ্রবে পাশাপাশি বাস করিতে পারিব। যেন এক বা অপর পক্ষের নিঃসংশয় বিলোপ সাধিত না হইলে সমস্যার সমাধান হইবে না। আরও একটা কথা চিন্তা করিবার আছে। যে তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় বিরোধ ঘনীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তাহাদের স্বার্থ যতদিন আমাদের পরাধীনতার সহিত জড়িত থাকিবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত বিরোধ আইনের বলে তাহারাই লালনপালন করিবে। ইণ্টারিম গবর্মেণ্টের কার্যকরী ঢেউ বাংলা দেশের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

এ ক্ষেত্রে বাংলা দেশের হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে অবাঙালী হিন্দুদের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। ১৬ই আগষ্ট হইতে আমরা এই শিক্ষাও অল্পবিস্তর লাভ করিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের আচার বা স্বার্থগত অন্যান্য যে বিরোধ, বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে তাহা বিলুপ্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। এই সত্য আমরা যেদিন সত্যসত্যই হৃদয়ঙ্গম করিব, সেদিন সকল অসুবিধা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা আত্মস্থ হইব। বাংলা দেশে বর্তমান শাসনতন্ত্র যেভাবে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, নিখিল ভারতবর্ষের আদর্শে বাংলার শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত না হইলে অদূরভবিষ্যতে বাঙালী হিন্দুকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইবে। সংস্কৃতিগত মৃত্যু না ঘটিলে তাহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। সুতরাং সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় হিন্দু-ভারতবর্ষের সহিত একাত্মবোধের দ্বারা সংযুক্ত হইলে আমরা বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারিব।

আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে, শক্তি-পূজার জন্য প্রস্তুতির কাল সমাগত। আমরা নব্যবাংলার শক্তিমন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। 'ধর্মতত্ত্বে'র গুরুর মুখে তিনি বলিতেছেন :—

"যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম।

রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে, এত খুন, জখম, চুরি-ডাকাতি, কাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপনসকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তিরক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাই তোমার বুঝা কর্তব্য। আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্মিক।

আত্মরক্ষা বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর, ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। সমাজত্ব এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণমানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসন বা ধর্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজ-শাসন নাই সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না, এ স্থলে আপন ও পর উভয়ের রক্ষার কথা এবং ধর্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা।

অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য।

সকলেরই সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র ষাট বৎসর পূর্বে উহা বুঝিয়াছিলেন—প্রয়োজন ব্যতিরেকেও বুঝিয়াছিলেন। আমাদের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, আমরা কি তবু বুঝিব না? বন্দে মাতরম্।

সমাধান

১

রায় বাহাদুর নৃপেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ছাদের উপর একলা পায়চারি করিতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ। বাড়ির সকলেই সুপ্তিমগ্ন। সারা শহরের জীবন-চাঞ্চল্য স্তিমিতপ্রায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা ছ্যাকড়া-গাড়ির খড়খড় শব্দ বা মোটরের হর্নের শব্দ কানে আসিতেছে। পাশের বাড়ির কুকুরটা ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে। দূরে রেল-ষ্টেশনে এঞ্জিনগুলা হুশ হুশ শব্দ করিয়া এক লাইন হইতে আর এক লাইনে যাওয়া-আসা করিতেছে; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশির শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ করিতেছে। শহরের বিদ্যুতের কারখানায় এঞ্জিনের অবিশ্রান্ত ঘটঘট শব্দ। জেলখানার পেটা ঘড়ি মাঝে মাঝে ঢং-ঢং শব্দে বাজিয়া সময়ের পদক্ষেপ নির্দেশ করিতেছে।

বিস্তৃত ছাদের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নতমস্তকে পদচারণ করিতেছেন। গভীর চিন্তামগ্ন ভাব। রায় বাহাদুরের বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দোহারা গঠন; রঙ ধবধবে ফর্সা; লম্বা ধরনের মুখ; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; মুখে পরিপুষ্ট গোঁফ; চুল ও গোঁফ দুই সাদা হইয়া উঠিয়াছে। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুরা, পায়ে চটি। যৌবনে দেহ ঋজু ছিল; দৃঢ় শক্তিমান ছিল; এখন বার্ধক্যের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়াছে। হাকিমি করিতেন। বৎসর কয়েক আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস করিতেছেন। বড় ছেলে অজিত ওকালতি পাস করিয়া এই শহরেই প্র্যাক্‌টিস করিতেছে; বয়স মাত্র ত্রিশ হইলেও ইহার মধ্যেই বেশ প্র্যাক্‌টিস জমাইয়াছে। আরও একজন ছেলে এবং দুইটি মেয়ে আছে তাঁহার। ছোট ছেলের নাম সুজিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস. সি. পাস করিয়া ডাক্তারি ডিগ্রীর জন্য যুদ্ধ বাধিবার আগে বিলাত গিয়াছিল, যুদ্ধের জন্য এখনও দেশে ফিরিতে পারে নাই। মেয়ে দুটির নাম যথাক্রমে মৈত্রেয়ী ও আত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী বিবাহিতা; পুত্র-কন্যার জননী। আত্রেয়ীর এখনও বিবাহ হয় নাই; তবে বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। অজিতেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার; গৃহিণী এখনও জীবিতা।

সূর্যের মত দীপ্ত গৌরবে জীবনাকাশ পরিক্রম করিয়া রায় বাহাদুর পাটে বসিয়াছেন। সরকারী চাকরিতে বাঙালী ডেপুটির চরম ও পরম কাম্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিলেন। নিখাদ রাজ-আনুগত্য ও ঐকান্তিক রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন। অতি সচ্ছল আর্থিক অবস্থা। দেশে জমিদারি কিনিয়াছেন, পৈতৃক পুরাতন বাড়ি মেরামত করিয়া নূতনের মত করিয়াছেন। শহরেও দুইখানি বাড়ি,

একটিতে নিজে বাস করিতেছেন, আর একটি ভাড়া খাটিতেছে। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার পরিমাণও সামান্য নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে করণ-কারণ করিয়াছেন। শহরে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাঁহার। সংসারেও সুখের সীমা নাই। পুত্রেরা স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত ও শ্রীমান; জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ তাহাদের সুনিশ্চিত। কন্যারা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। বড় জামাইটি মুনসেফ। যে ছেলেটির সঙ্গে ছোট মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, সে ছেলেটি সম্প্রতি সাব-ডেপুটীর চাকরিতে বহাল হইয়াছে। ভালভাবে চাকরি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ডেপুটী হইতে পারিবে। কাজেই মেয়েদের জীবনেও সুখ-সৌভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। রায় বাহাদুরের গৃহিণী প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াও দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এখনও বজায় রাখিয়াছেন। পুত্রবধূ রূপবতী গুণবতী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী। নাতি-নাতিনীগুলিও সদ্যফোটা ফুলের মত সুন্দর; অবিরত আনন্দোচ্ছল কলহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। মোট কথা, রায় বাহাদুর সুখী ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁহার সুখ ও সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত।

এ হেন ব্যক্তি যে রায় বাহাদুর, তিনি রাত্রির তৃতীয় যামে সুখশয্যায় সুপ্তিমগ্ন না থাকিয়া বিনিদ্র-চক্ষে কুঞ্চিত-কপালে একাকী পদচারণ করিতেছেন কেন? ইহার কারণ একটি মাত্র চিঠি।

সকালে বেড়ানো রায় বাহাদুরের অভ্যাস। বড় রাস্তা ধরিয়া শহর ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া যান; ফিরিতে নয়টা বাজিয়া যায়। আসিয়া স্নানাহ্নিক করেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈঠকখানার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইয়া আগের দিনের খবরের কাগজটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকান। বেলা এগারোটার সময়ে ডাক-পিয়ন চিঠি বিলি করে। তাহারই আগমনপ্রত্যাশায় এই উৎকণ্ঠা। বিদেশে ছেলেমেয়েরা থাকে; তাহাদের সংবাদের জন্য মন সর্বদাই সতৃষ্ণ থাকে। সেদিনও যথারীতি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন রায় বাহাদুর। পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। কয়েকটা খাম ও পোষ্টকার্ড। পোষ্টকার্ডগুলি গৃহিণী ও পুত্রবধূর। খাম তিনটির একটা অজিতের, লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির তাগিদ-পত্র; বাকি দুইটি তাঁহার। বাকি চিঠিগুলি পাশের ছোট টেবিলে রাখিয়া তিনি একটি খাম খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। ছোট মেয়ের ভাবী শ্বশুরের চিঠি। চিঠিটার তাড়াতাড়ি আদ্যোপান্ত চোখ বুলাইয়া লইলেন। তারপর চিঠিটা খামে ঢুকাইয়া টেবিলে রাখিলেন। এমন সময়ে চাকর গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিতে আসিল। তাহাকে চিঠিগুলি অন্দরে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া, দ্বিতীয় খামটির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ঠিকানাটি মেয়েলী হাতে লেখা। লেখার ছাঁদ অপরিচিত মনে হইল। যাহাদের কাছ

হইতে হামেশা চিঠি পান, তাহাদের কাহারও নহে নিশ্চয়ই। পরম ঔৎসুক্যসহকারে খামটি খুলিলেন। এক্সারসাইজ খাতার পাতায় লেখা মোড়ক-করা চিঠি বাহির হইল। চিঠিটি খুলিয়া তিনি পড়িতে শুরু করিলেন—

পরমারাধ্য, পরমপূজনীয়,

বাবা! আজ কুড়ি বছর পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। এতদিন যে চিঠি লিখি নি তার কারণ এ নয় যে, তোমার কথা আমি ভুলে গেছি। কুড়ি বছরের প্রত্যেক দিন তোমার কথা ভেবেছি; কোথায় আছ, কেমন আছ জানবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছি; তোমাকে একটিবার দেখবার জন্যে ছটফট করেছি; খবরের কাগজ পেলেই খবরের কাগজে সরকারী চাকরেদের বদলির খবর যেখানটায় থাকে, তন্নতন্ন ক'রে পড়েছি। আমি আসবার পর তুমি কখন কোথায় বদলি হয়েছ, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু, পাছে তুমি বিরক্ত হও, মা রাগ করেন, তোমার সম্মান ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে চিঠি লিখতে সাহস করি নি। কতবার চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে, পৃথিবীতে কারও বিরক্তি, রাগ বা সম্ভ্রম-হানি বাঁচিয়ে চলা আর চলছে না। পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ-সূত্র যখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, তখন যাঁদের মাঝে জন্মেছি, যাঁদের স্নেহে যত্নে একদিন প্রতিপালিত হয়েছি, তাঁদের সঙ্গে দেনা পাওনা চুকিয়ে দেবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যাঁর হাত ধ'রে একদিন সমাজ, সংসার ও সংস্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সামাজিক শ্রেণীবিভাগে তাঁর স্থান হয়তো নীচে ছিল, কিন্তু হৃদয় ও মনের দিক দিয়ে তিনি পৃথিবীতে কারও চেয়ে ছোট ছিলেন না। তিনি আমাকে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি, আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে তা জোটে না। আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ছেড়ে চ'লে আসার দুঃখ ও বেদনা তাঁর অপরিমিত অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধায় তিনি মুছে দিয়েছিলেন। আমি জীবনে সত্যি সুখী হয়েছিলাম, বাবা। এমন কি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিলাম একদিন।

যেখান থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি, এই গ্রামেই আমাদের বিবাহের পর আমরা এসেছিলাম। এখানে নিজের চেষ্টায় ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে তিনি একটি ছোট স্কুল গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। স্কুলটাকে ভাল করবার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটতেন। মাহিনা অল্পই ছিল। তবে গ্রামের সকলে তাঁর উদার সরল মন ও মধুর ব্যবহারের জন্য তাঁকে খুব ভালবাসত। সকলেই যার যতটুকু সাধ্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করত। পাড়াগাঁ, স্বামী আর একমাত্র ছেলে নিয়ে ছোট সংসার; কষ্টে সৃষ্টে চ'লে যেত আমাদের।

চার বছর আগে তিনি চ'লে গেলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পাড়াগাঁয়ে

যতটা সম্ভব চিকিৎসা হ'ল। কিছুতেই রাখা গেল না তাঁকে। ছেলে আমার সে বৎসর ম্যাট্রিক দিয়েছে। আমাদের গাঁ থেকে তিন-চার মাইল দূরে একটা বড় স্কুল আছে। এই রাস্তা হেঁটে ওই স্কুলে সে পড়তে যেত। এখানে রাস্তাঘাট ভাল নয়। বর্ষায় তো সব ডুবে যায়; নৌকো ক'রে যেত আসত তখন। কাপড়, জামা, জুতো, ছাতা তাকে কোনদিন নিয়মিতভাবে দিতে পারতাম না। কত কষ্টে সে যে পড়াশোনা করত দেখে চোখের জল সামলাতে পারতাম না। তবে বাপ-মার বড় দরদী ছেলে ছিল সে; যত কষ্টই হোক, মুখের হাসিটুকু কখনও নিবত না। পাসও করেছিল ভাল ক'রেই। উনি দেখে যেতে পারেন নি।

ওঁর মৃত্যুর পর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় যাই, কি করি, কেমন ক'রে ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তুলি, ভেবে চোখের ঘুম আমার উবে যেত। সে সময়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখব ব'লে ভেবেছিলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। কারণ তোমার ব্যবহার আমি ভুলতে পারি নি। মহকুমা হাকিম হিসাবে তুমি আমাদের গাঁয়ে এসেছিলে, ওঁকে চিনতেও পেরেছিলে; কিন্তু একবার দেখা দিয়ে পর্যন্ত যাও নি। পাছে কখনও দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এ মহকুমা থেকে চ'লে গিয়েছিলে। আমার ওপরে তোমার রাগ ও বিরাগ যে বিন্দুমাত্র কমে নি, তা বুঝতে পেরেছিলাম। তবে তুমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে, বাবা! তুমি আবার এখানে এলেও আমি নিজে থেকে কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতাম না। যেখানে স্নেহ নাই, সেখানে স্নেহের দাবি জানাতে যাওয়ার মত অপমান আর নেই, এ শিক্ষাটুকু আমি ওঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

এ গাঁয়ের সাহাবাবুরা খুব বড়লোক। শহরে মস্তবড় পাটের আড়ত। ছেলে বললে, আড়তে চাকরি করবে সে, পড়াশুনা ছেড়ে দেবে। আমি রাজি হলাম না। সাহা-গিন্নীকে গিয়ে ধরলাম। ওঁদের মস্তবড় সংসার, রান্না-বান্নার জন্যে বাঁধুনী একজন বরাবর থাকে। এই কাজটি চাইলাম। সাহা-গিন্নী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন; খোকাকেও ভালবাসতেন। অনেক খুঁতখুঁত ক'রে তিনি রাজি হলেন।

খোকা কলেজে পড়তে গেল। মাইনেটা আমি দিতাম। কিন্তু খাওয়া-থাকার খরচের জন্যে দু-দুটো টিউশানি করতে হ'ত। এত পরিশ্রম, কিন্তু খেতে পেত না ভাল। শরীর ভেঙে গেল তার। ছুটিতে যখন বাড়ি এল, দেখি, আধখানা হয়ে গেছে। ভয়ে শুকিয়ে গেলাম। গ্রামের কবিরাজকে বলতেই বিনা-পয়সায় ওষুধ দিলেন। সাহা-গিন্নী ভাল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সত্যি, বাবা, এই সব আত্মীয়দের কাছ থেকে এত উপকার পেয়েছি যে, জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। যদি কোনদিন সুদিন আসত, শোধ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না। ঋণ মাথায় ক'রেই চললাম।

দু বছর পরে খোকাকে হারালাম। একদিন খবর পেলাম, খুব অসুখ। কান্নাকাটি করতে লাগলাম। সাহাবাবুরা লোক দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন সব প্রায় শেষ। আছড়ে প'ড়ে বুক-ফাটা চীৎকার ক'রে ডাকলাম খোকাকে; ডাক কানে তার পৌঁছুল না। আমার চোখের সামনে খোকা আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়ে গেল।

কলেজের ছেলেগুলি কত সান্ত্বনা দিলে, কত সাহায্য করলে। তখন একটা কথা আমার মনে হয়েছিল, তারা যদি আমার সত্যকার পরিচয় জানত, তা হ'লে কি এমনই শ্রদ্ধা করত? এমনই সহানুভূতি জানাত? কে জানে!

গাঁয়ে ফিরে এলাম। সাহা-গিন্নী দিন কয়েক কাজ করতে দিলেন না। একলা ঘরে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদতাম। পাড়ার বউ-ঝিরা কখনও কখনও আসত, সান্ত্বনা দিত। স্কুলের ছেলেরা খোঁজখবর করত মাঝে মাঝে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই একলা থাকতাম। স্বামী-পুত্র হারিয়ে বেঁচে থাকা অনর্থক মনে হ'ত। রাত্রে সাহাবাবুদের একটা ঝি আমার কাছে শুত। সে ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমোত সারারাত। আমি বাইরে দাওয়ায় অন্ধকারে একলা ব'সে দু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতাম, যদি খোকা একবার দেখা দিয়ে যায় এই আশায়। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় করত। এখন অন্ধকারে একলা থাকতেই চাইতাম। কেউ কাছে থাকলে বরং বিরক্ত হতাম। ভয় হ'ত, পাছে খোকা দেখা দিতে এসে কাউকে কাছে দেখে ফিরে চ'লে যায়। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করবার লোভ হ'ত। লোভ সামলে নিতাম। ভাবতাম, গত জন্মে কত পাপ করেছি, তার এই শাস্তি; এ জন্মে আবার পাপ ক'রে পরজন্মের পথে কাঁটা দেব না। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, মৃত্যু দাও, আমার মত অভাগীকে বাঁচিয়ে রেখে আর দুঃখ দিও না।

ব'সে ব'সে পরের ঘাড়ে কত দিন খাওয়া যায়? কাজে যোগ দিলাম। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে হ'ত। আমার শোকাচ্ছন্ন নির্জন ঘরটি আমাকে প্রতি মুহূর্তে টানত। মনে হ'ত, খোকা যেন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। খোকা যখন ছিল, তখন খোকাকে বাড়িতে রেখে কোথাও গেলে যেমন সারাক্ষণ মনের মধ্যে যাই যাই ভাব হ'ত, এখনও তেমনই হ'ত। খোকার জন্যে শোক আর খোকা আমার মনের মধ্যে যেন এক হয়ে গিয়েছিল। এই শোকের মধ্যেই আমি খোকাকে কাছে পেতাম। ভয় হ'ত, পাছে শোকের আগুন আমার কোনদিন নিবে যায়, তা হ'লেই খোকাকে আমি সত্যি সত্যি হারিয়ে ফেলব। তাই সাগ্নিকের মত শোকাগ্নিকে আমি লালন করতাম। খোকার কাপড়-জামা, বই-খাতা, আর আর জিনিস যা সে ব্যবহার করত, ঘরের এক জায়গায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলাম। প্রত্যেক দিন কাজ থেকে ফিরে

এসে সেগুলি দেখতাম, নাড়া-চাড়া করতাম, বুকে চেপে ধরতাম। আমার শোকের আগুন অনির্বাণ জলতে থাকত।

ভগবান আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। পাঠিয়েছেন মৃত্যুর পরওয়ানা। দেহে ঢুকেছে অসাধ্য-রোগ—ক্ষয়রোগ। কবিরাজ বলেছে, আর বেশি দিন থাকতে হবে না পৃথিবীতে। সাহাবাবুদের বাড়ির চাকরি গেছে। ওঁদের দয়া-মায়ার সীমা নেই; এখনও ওষুধ-পথ্য যোগাচ্ছেন। এখন আর কেউ কাছে এসে বসে না; দূর থেকে খবর নিয়ে চ'লে যায়। আমি একলা ঘরে প'ড়ে প'ড়ে কবে আবার স্বামী-পুত্রের সঙ্গে মিলতে পারব, তারই জন্তে দিন গুনছি।

যতই যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে, ততই একটা প্রশ্ন মনে জাগছে—কেন এত দুঃখ পেলাম জীবনে? সমাজ-বিধান লঙ্ঘন করার শাস্তি? সমাজ-বিধান মানুষের তৈরি। হাজার হাজার বছর আগে তখনকার দিনের মানুষের সুখসুবিধার জন্তে তখনকার দিনের চিন্তাশীল মানুষেরা এই বিধান রচনা করেছিলেন। আজ হাজার হাজার বছর পরে মানুষ কত বদলেছে; কত বদলেছে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধি, মনের গতি-প্রকৃতি, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ। আজ আর সেই প্রাচীন বিধান কখনও চলতে পারে না। আধুনিক কালের মানুষের জন্তে আধুনিক কালের চিন্তাশীল লোকদের নূতন ক'রে বিধান রচনা করতে হবে। কাজেই প্রাচীন সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা পাপ নয়, অপরাধও নয়। তা ছাড়া, আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় কেউই চুল-চেরা বিচার ক'রে সমাজ-বিধি মেনে চলেও না। কে শাস্তি পাচ্ছে আমার মত? তবে কি বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করায় আমার শাস্তি? বিধাতা আমার কপালে লিখেছিলেন আমরণ দুঃখ। ভাল ক'রে জ্ঞান হতে না হতেই মাকে কেড়ে নিলেন; বিয়ের এক বছর যেতে না যেতে মুছে দিলেন সিঁথির সিঁদুর। সেই বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে আমি সুখী হতে চেয়েছিলাম। তাই কি আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিলেন? কিন্তু একবার দুঃখ পেয়েই তাকেই চরম ও চিরন্তন পরিণাম ব'লে মেনে নেওয়াই কি মানুষের ধর্ম? কেই বা নেয়? সবাই দুঃখকে কাটিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে। আমিও তো সুখী হয়েছিলাম, বাবা! যদি সেই দুঃখকে মেনে নিতাম, তা হ'লে জীবনের কয়েকটা বছর যে স্বর্গসুখের আস্বাদ পেয়েছি, তা কি পেতাম?

তাই মনে হয়, তোমাদের দুঃখ দিয়েছি ব'লে আমার এই দুঃখ। দাদুর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি ফিরে এসেছে, মালিকের সন্ধান মেলে নি। খুব সম্ভব দাদু চ'লে গেছেন। তাঁর কাছে এ জগতে আর ক্ষমা চাওয়া হ'ল না। পরপারে গিয়ে যদি দেখা হয়, ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে ক্ষমা পেতে চাই।

তোমার ক্ষমা-স্নিগ্ধ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই। এই সাধ আমার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে দিন দিন।

আর একটি সাধ—শেষের কয়েকটা দিন তোমার কাছে থাকবার, তোমার চোখের সামনে মরবার। মনে হচ্ছে, তুমি থাকতেও কেন এমন অনাথা ভিখারিণীর মত আমাকে চ'লে যেতে হবে? কেউ দেখবে না, শুনবে না, দুদণ্ডের জন্ত পাশে দাঁড়াবে না, যেদিন চিরদিনের মত ফুরিয়ে যাব, একবিন্দু চোখের জল ফেলবে না। এই কটা দিনের জন্তে আমাকে আশ্রয় দিতে পার না, বাবা? তোমার বাড়ির একপাশে যেখানে চাকর-ঝিরা থাকে সেখানে? মেয়ে ব'লে বরং কাউকে পরিচয় দিও না। ব'লো, অনাথা মেয়ে রাস্তায় প'ড়ে ছিল, দয়া ক'রে মরবার জন্তে জায়গা দিয়েছ। মানুষের মত মানুষ যারা, তারা তো এমন দয়া করে। তা ছাড়া যা চেহারা আমার হয়েছে, এখন আর আমাকে কেউ চিনতে পারবে না; পরিচয় না দিলে হয়তো তুমিই পারবে না।

যদি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমাকে চিঠি লিখে জানিও। এখান পর্যন্ত তোমাকে আসতে হবে না। এখান থেকে কেউ সঙ্গে গিয়ে ষ্টীমার-ঘাটে আমাকে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে তুমি আমাকে নিয়ে যেও। তবে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক'রো, বাবা, না হ'লে হয়তো আর দেখা হবে না।

আমার প্রণাম নাও। মাকে প্রণাম দিও। আর ছোট ভাই-বোনদের আশীর্বাদ।

প্রণতা
হতভাগিনী কন্যা
সুমিত্রা

২

রায় বাহাদুর চিঠিখানি আদ্যোপান্ত বার দুই পড়িলেন। তারপর চিঠিখানি কোলের উপরে রাখিয়া, ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইয়া জীবনের অতীত অধ্যায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর কথা প্রথমে মনে পড়িল। শ্যামবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, চলচলে কচি মুখ। সরু সরু ঠোঁটে অবিরত হাসি লাগিয়াই থাকিত। যৌবনেও বালিকার মত চঞ্চল। তড়বড় করিয়া কথা বলিত, খরখর করিয়া চলাফেরা করিত, একটু কৌতুকের আভাসে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাপের একমাত্র মেয়ে, অতি শৈশবে মা-হারা, অত্যন্ত আদুরে, আবদারে। কথায় একটু আঁচ সহ্য করিতে পারিত না; সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলাইয়া অভিমানের মেঘ নামিত। বাবার কাছেই থাকিত বেশি। ছয় বৎসরের বিবাহিত জীবনে তাঁহার কাছে দুই বৎসরের বেশি ছিল না। শ্বশুর মশায় মেয়েকে কাছছাড়া করিতে চাহিতেন না। বিন্দু কুণ্ঠিত

হইত; মিনতি করিয়া বলিত, কি করবে বল! বাবা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না; ভাইবোন তো আর কেউ নেই! কদিনই বা আর বাঁচবেন! যতদিন থাকেন ওঁর কাছেই থাকতে দাও। মাথার দিব্য দিয়া কহিত, তুমি কিন্তু ভুলে থেকো না; মাসে অন্তত একবার দেখা দিও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হইতে হইত তাঁহাকে। ছাত্রজীবনে অসুবিধা হইত না। মাসে একবার নয়, সপ্তাহে একবার দেখা দিয়া আসিতেন। চাকুরি-জীবনে সে সুবিধা ঘটিত না। তবে সুযোগ পাইলেই পত্নী-সন্দর্শন করিতেন। সেবার খুকীর প্রসবের পূর্বে বাপের বাড়ি যাইবার আগে বিন্দুর কি কান্না! শ্বশুর লোক পাঠাইয়াছিলেন লইয়া যাইবার জন্য। বিন্দু কিছুতেই যাইতে রাজি হইল না; কহিল, না, এখন যাব না; আর দেখা হবে না তা হ'লে; যা হয় তোমার কাছেই হোক। যাইবার সময়ে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল বিন্দু। অন্যবারেও যাইবার আগে কাঁদিত বিন্দু, কিন্তু সে যেন জোর করিয়া চোখে জল টানিয়া আনা। এবারের কান্না অকৃত্রিম। প্রথম মা হওয়া মেয়েদের জীবন-মরণ সমস্যা। অনেক সান্ত্বনা, সাহস, নিয়মিত দেখা দেওয়ার এবং ছুটি লইয়া ঠিক সময়ে কাছে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে চুপ করাইতে হইয়াছিল। ছুটি পাইয়াছিলেন খুকী জন্মাইবার দুই মাস পরে। রাত্রি দশটার সময়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিলেন। শ্বশুর মশায় কি বিপদ গিয়াছে, কি ভাবে বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন চিঠিতে জানানো সত্ত্বেও মৌখিক পুনরাবৃত্তি করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরেও শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে গল্প শেষ করিয়া যখন ছুটি পাইলেন, তখন রাত্রি বারোটা। শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু ঘুমাইতেছে; বিন্দুর কোলের কাছে ঘুমাইতেছে খুকী, ঠিক যেন মোমের পুতুল। ধবধবে ফরসা রঙ; বিন্দুর মতই লম্বা ধরনের মুখ, মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। বিন্দুর গায়ে হাত দিলেন, কোন সাড়া নাই; একেবারে অঘোরে ঘুমাইতেছে। বাহুমূলে নাড়া দিয়া চাপাস্বরে ডাকিলেন, এই! শুনছ! বিন্দু তাঁহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। বুঝিলেন, অভিমান হইয়াছে। সে রাত্রে অনেক কষ্টে অভিমান ভাঙিতে হইয়াছিল। বিন্দু বলিয়াছিল, হ্যাঁ গো! ছেলে হ'ল না ব'লে দুঃখু পাও নি তো? হাসিয়া কহিয়াছিলেন, পাগল! মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিয়াছিল বিন্দু, সবাই বলছে প্রথমে মেয়ে হ'লে বাপের ভাগ্যি খুব ভাল হয়; খুকীর পরে তোমার খু—উ—ব উন্নতি হবে, দেখো।

তাঁহার কাছেই বিন্দুর মৃত্যু হইয়াছিল। বেশ ভাল ছিল। হঠাৎ জ্বরে পড়িল। ডাক্তার বলিল, ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া। তখন ইন্‌জেক্‌শনের তেমন চলন হয় নাই। তিন দিনের জ্বরে বিন্দু মারা গেল। মরিবার আগে জ্ঞান ছিল না বিন্দুর। কোন কথা না বলিয়াই সে চলিয়া গেল। শ্বশুর মশায়কে খবর দেওয়া হইয়াছিল। বিন্দুর মৃত্যুর

পরদিন আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই সোৎকণ্ঠ প্রশ্ন, কোথায় সে? চল, একবার দেখি গে। সংবাদ শুনিবামাত্র আছাড় খাইয়া পড়িলেন। মেঝেতে লুটাইতে লুটাইতে সে কি বুকফাটা কান্না! তাহার পরের দিনই চলিয়া আসিলেন। কহিলেন, বিন্দু নেই, থাকতে পারছি নে এখানে। কিছু মনে ক'রো না বাবা! তবে একটি প্রার্থনা আছে আমার; ওর মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। যেমন ক'রে তাকে মানুষ করেছিলাম, তেমনই ক'রে ওকেও মানুষ করব। না হ'লে কি নিয়ে থাকব বল! তোমাকে আবার বে-থা করতেই হবে; মেয়েটার অযত্ন হবে।

তাহার পর হইতে দাদুর কাছেই মানুষ হইতে লাগিল খুকী। এক বৎসর পরে তিনি আবার বিবাহ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপকের মেয়ে মালবিকাকে। নিষ্ঠাবান পিতার নিষ্ঠাবতী কন্যা; অত্যন্ত আচারপরায়ণা। স্নান-আহ্নিক, জপ-তপ, বার-ব্রত, আচার-বিচার ইত্যাদিতে পিতার কাছে হাতে-কলমে সুশিক্ষিতা। তিনি নিজে কিছুই মানিতেন না। কিন্তু মালবিকা আসার পর হইতে বাহিরে না হউক, ভিতরে তাঁহাকে সবকিছু মানিয়া চলিতে হইত। খুকী মাঝে মাঝে আসিত। মালবিকা খুব আদর করিত তাহাকে। কিন্তু সে আদরের সঙ্গে যে তাহার অন্তরের যোগ থাকিত না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন।

খুকীর বিবাহের সময়ে সপরিবারে গিয়াছিলেন। যে ছেলেটির সঙ্গে বিবাহ হইল, দেখিতে শুনিতে ভাল; অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে; এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। খুকী দেখিতে ঠিক বিন্দুর মতই হইয়া উঠিয়াছিল, তবে বর্ণ শ্যাম নয়, শাঁখের মত ধবধবে ফরসা। তিনিই খুকীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহ-মণ্ডপের দৃশ্যটি চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। তাঁহার পাশে খুকী ব্রীড়ানত মুখে বসিয়া; পরনে আগুনের মত রঙের বেনারসী শাড়ি; সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। সামনে বসিয়া সেই ছেলেটি, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রঙ, দৃঢ়-পেশীবহুল দেহ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ছেলেমানুষের মত মুখ, মুখে লজ্জা ও কৌতুকের আভাস। ছেলেটির দক্ষিণ করতলে মেয়ের বাম করতল চাপিয়া ধরিয়া তিনি সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। শ্বশুর মশায় কাছে বসিয়া ছিলেন, হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, পর হয়ে গেলি, দিদি!

বৎসর খানেক পরে খুকী বিধবা হইল। জামাইয়ের পরীক্ষার বৎসর। সারা-বৎসরের মধ্যে একবারও আসিতে পারে নাই। শুধু বিবাহের পরে কয়েকদিনের জন্য স্বামী-সঙ্গ পাইয়াছিল খুকী। স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয়ও হয় নাই। তাহার পূর্বেই স্বামীকে হারাইল। খবর পাইয়া তিনি গিয়াছিলেন। খুকীর বিধবার বেশ দেখিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া খুকী ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদিয়াছিল। শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, সংসারের সাধ আমার মিটেছে, বাবা! নিয়ে যাও ওকে, ওর সন্ন্যাসিনীর বেশ চোখে দেখতে পারছি না আমি।

খুকী তাহার দাদুর কাছেই রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে খুকীকে দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি। খুকী অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুর মশায় খুকীকে পুরাপুরি বিধবার বেশ পরিতে দেন নাই। দেখিলেন, খুকীর পরনে চুলপাড় ধুতি, গলায় একটি সরু হার, হাতে চারগাছি করিয়া সোনার চুড়ি; মুখখানিতে শান্ত বিষণ্ণতা। বিধবার কঠোর আচারও পালন করিতে হয় না তাহাকে। দেখিয়া সুখীই হইয়াছিলেন তিনি। একদিন তো সবই করিতে হইবে; এত তাড়াতাড়ি কেন? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্বশুর মশায়। গৃহ-শিক্ষকটিকে দেখিয়াছিলেন তিনি। কায়স্থের ছেলে; বয়স খুব বেশি নয়; দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। শ্বশুর মশায়ের কাছে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেই তিনি বলিয়াছিলেন, ভারি ভাল ছেলে; অত্যন্ত সচ্চরিত্র; শহরে ওর জোড়া নেই; গরিবের ওপর ভারি দয়ামায়া; শহরের ছেলেদের নিয়ে সেবক-সমিতি করেছে; তা ছাড়া পিকেটিং ক'রে বার-দুই জেল খেটে এসেছে; ওর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ক'রো না বাবা। তিনি আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

বৎসর দুই পরে শ্বশুর মশায়ের কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন, বড় বিপদ, সত্বর এস। সাহেবের কাছ হইতে ছুটি লইয়া তিনি গিয়াছিলেন। যাইয়া দেখিলেন, শ্বশুর মশায় শয্যাশায়ী। বহুদিন গুরুতর রোগে ভুগিয়াছেন এমনই মুখ-চোখের ভাব। পরম উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কতদিন ধ'রে ভুগছেন? শ্বশুর মশায় ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, আমার কিছু নয়, খুকী নেই। চমকিয়া উঠিয়া আর্তকণ্ঠে তিনি কহিয়াছিলেন, খুকী মারা গেছে? কখন? কি হয়েছিল? আমাকে জানান নি কেন আগে? একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন শ্বশুর মশায়; দুই চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল; অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, মারা যায় নি, মারা গেলে তো ভাল ছিল।

ক্রমে ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন। আট-দশ দিন আগে সেই গৃহ-শিক্ষকটির সঙ্গে কি একটা সভায় গিয়াছিল খুকী। আর ফিরে নাই। অনেক খোঁজ করা হইয়াছে, পুলিসে খবর দেওয়া হইয়াছে, চারিদিকে চিঠি ও তার পাঠানোও হইয়াছে, কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারা, শুনিয়া দুঃখের চেয়ে রাগ হইয়াছিল বেশি; কড়া গলায় বলিয়াছিলেন, আমি জানতাম এ হবে; যেভাবে রাশ আলগা করেছিলেন, এ তার অনিবার্য ফল। আমি আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম; আপনি শোনেন নি। মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না; হিন্দু বিধবার জন্যে

যে কঠোর আচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছিলেন। শ্বশুর মশায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, যত ইচ্ছে তিরস্কার কর, আমার কিছু বলবার মুখ নেই; তোমার মাথা হেঁট করেছি আমি। তিনি বলিয়াছিলেন, শুধু আমার নয়, আপনার নিজেরও। এ শহরে মুখ দেখাবেন কি ক'রে? শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, মুখ আর দেখাব না, বাবা! সব বেচে-টেচে দিয়ে কাশীবাস করব ভাবছি। আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। যাকে ধরতে যাচ্ছি, সেই ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আর খোঁজ করবার দরকার নেই। ফিরে এলে ঘরে ঢোকাবেন কি ক'রে? মনে করুন, মারা গেছে সে। শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, যদি চোখের সামনে মরত তো নিশ্চিন্ত হতাম। কোন্ ভাগাড়ে মরবে কে জানে? যে আমাকে ঠকিয়েছে, সে যে তাকেই ঠকাবে না কে বললে? কাউকে আর পৃথিবীতে বিশ্বাস নেই। মানুষ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পশুত্বের স্তরে নেমে যাচ্ছে। পশুদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে; শৃগাল সিংহিনীর সঙ্গে মিলবার স্পর্ধা করে না। মানুষের মধ্যে তাও থাকবে না, সব একাকার হয়ে যাবে। এসব দেখতে পারব না চোখে। যত শীঘ্র স'রে যেতে পারি, ততই মঙ্গল।

তিনি কহিয়াছিলেন, শৃগালের স্পর্ধা তো আপনা হতেই হয় না। সিংহিনীকেও তার মর্যাদা রাখতে জানতে হবে। সেইজন্যে শক্ত হতে হবে আমাদের। খুকী যেখানে গেছে যাক, সুখ অদৃষ্টে থাকে সুখী হোক, কিন্তু কোনদিন যেন আর আমাদের চৌকাঠ পার না হতে পারে। আর খোঁজ করবেন না তার। নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না। যদি ফিরে আসে, কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবেন।

মুখে কঠিন কথা বলিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু বুকের মধ্যে বসিয়া পিতৃস্নেহ শরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করিয়াছিল। মুখে অন্ন রোচে নাই; রাত্রে ঘুম আসে নাই। নিস্তব্ধ নির্জন ঘরে জানালার ধারে বসিয়া, বাহিরে অন্ধকারময়ী ধরিত্রীর দিকে তাকাইয়া, কণ্টকময় জীবনপথের যাত্রী মেয়েটির অনিবার্য শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিয়া সারারাত্ত চোখের জল ফেলিয়াছিলেন।

মালবিকাকে পরিচয় দিতেই সে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও কি হ'ল? গম্ভীর মুখে জবাব দিয়াছিল মালবিকা, প্রণাম করলুম বাবাকে; ঋষিতুল্য মানুষ, যা বলেন বেদবাক্যি, মিথ্যে হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন, তার মানে?

মালবিকা কহিয়াছিল, আমি সব পরিচয় দিয়েছিলুম বাবাকে; তিনি বলেছিলেন, এর ফল ভাল হবে না, ও মেয়েকে ঘরে রাখা দায় হবে। হিন্দুর বিধবাকে কত সাবধানে থাকতে হয়! কত আচার-বিচার উপোস-কাপাস; খাওয়া-পরা শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটু; একটুকু ইতরবিশেষ হ'লেই সর্বনাশ। আমার ছোট

বোন মাধুকে দেখ নি, বাইশ বছর মাত্র বয়স, কিন্তু এমন কড়াকড়ি আচারের মধ্যে আছে যে, কে বলবে ওর বয়স বেয়াল্লিশ নয়?

তারপর হইতে তাহার সংসারে খুকীর প্রসঙ্গ একেবারে উঠে নাই; উঠিবার উপক্রম হইলে মালবিকা নিষেধের তর্জনী তুলিয়া সতর্ক করিয়া দিত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা জানিত, খুকী মারা গিয়াছে; ছেলেপিলেরা, দুই-একজন ছাড়া, খুকী বলিয়া তাঁহার কোন মেয়ে ছিল, তাহা জানিত পর্যন্ত না।

ক্রমে চাকুরি-জীবনে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। সম্মান, প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য্য-বিলাস জোয়ারের মত আসিয়া জীবনকে কূলে কূলে ভরিয়া দিল। কিন্তু খুকীকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কর্ম-ব্যাপৃতির মধ্যেও তাহার কথা নিরন্তর মনে জাগ্রত। বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে? যদি বাঁচিয়া থাকে, হয়তো পঙ্কিল কদর্য্য জীবন যাপন করিতেছে; হয়তো পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে, কিংবা কুৎসিত রোগে ভুগিতে ভুগিতে কোথাও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। যখনই কোন ভিখারিণী দেখিতেন, একটু ভদ্রগোছের চেহারা, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, খুকী নয় তো? কোন শহরে গেলেই হাসপাতাল দেখিতে যাইতেন, বিশেষ করিয়া মেয়েদের ঘরগুলি, কোথাও যদি খুকীকে দেখিতে পান এই আশায়। জীবনের সুখ ও আনন্দকে খুকী বিস্বাদ করিয়া দিত।

দশ বৎসর পরে। তিনি তখন পূর্ববঙ্গের একটা জেলার সদর-মহকুমা-হাকিম। একটি গ্রামের মধ্য-ইংরেজী স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ আসিল। সেক্রেটারি নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি গিয়াছিলেন। গিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, সেই লোকটি—যাহার প্ররোচনায় খুকী গৃহত্যাগ করিয়াছে। লম্বা-চওড়া চেহারা; বেশ-ভূষা অতি সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা সবই ধবধবে সাদা। হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায় চাল-চলনে এমনি একটি শান্ত-গাম্ভীর্য, অনমনীয় মহনীয়তা, অথচ মৃদু নম্রতা যে, সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সামান্য লোকগুলার মধ্যে থাকিয়াও সে অসামান্য এবং সর্বসাধারণের সম্মানের পাত্র বুঝিতে দেরি হয় না। যতটুকু আবশ্যক তাহার বেশি আলাপ তাহার সঙ্গে তিনি করেন নাই। কিন্তু একটা কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তিনি তো আর একটি কন্যার বিবাহ দেখিয়া-শুনিয়া দিয়াছেন, জামাইটি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, নৈকষ্য কুলীন, শিক্ষিত ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহার তো তুলনা হয় না! লোকটিও খুব সম্ভব চিনিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবারও চেষ্টা করে নাই, ঘনিষ্ঠতা করিবারও চেষ্টা করে নাই, যতটুকু সম্মান তাঁহার প্রাপ্য, পুরাপুরি দিয়াছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ ও জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সভায়

একটি আট-নয় বৎসরের সুশ্রী ছেলে তাঁহার গলায় মালা পরাইয়াছিল। এবং একটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল; ছেলেটির সপ্রতিভ ভঙ্গী, কোমল মধুর কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ছেলেটি হেডমাষ্টার মহাশয়ের। ছেলেটির অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন সেক্রেটারি মশায়। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, ছেলেটিকে ডাকিয়া তিনি আদর করেন, কিছু পুরস্কার দেন। সে ইচ্ছা তিনি দমন করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইয়াছিল, হেডমাষ্টারকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছে তাহারা, কেমন আছে খুকী। সে ইচ্ছাও দমন করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সাধারণ মৌখিক ভদ্রতা করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন তিনি। আসিয়া কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই, মালবিকাকেও না। তবে মনে মনে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, স্বামী পুত্র লইয়া সুখে আছে খুকী। নাই বা থাকিল ধন-ঐশ্বর্য! আছে স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান, মানুষের মত মানুষ স্বামী, সুন্দর সন্তান; এর বেশি মেয়েমানুষ কি চায়? তারপর আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাদের; কিন্তু সুযোগ পান নাই; তারপরই সেখান হইতে বদলি হইয়া গিয়াছিলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরকারী কাজে সারা বাংলা দেশ তিনি ঘুরিয়াছেন। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ধরনের বহু লোকের সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন। সমাজে যে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হইয়াছে চোখ মেলিয়া দেখিয়াছেন, এবং ইহার কার্য-কারণ-যোগসূত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইয়াছে, খুকীকে এমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখার কি কোনও যুক্তি আছে? প্রাচীন সমাজবিন্যাস যখন ক্রমে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে আবহমানকাল ধরিয়া যে বাধার প্রাচীরগুলি ছিল, তাহা একে একে ভাঙিয়া পড়িয়া প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথ প্রস্তুত হইতেছে, প্রাচীন প্রথা ও লোকাচারকে অবহেলা করিয়া মানুষ অবাধে, যাহার যে পথে ইচ্ছা, চলিতেছে, তখন তিনি কন্যাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেন মিথ্যা দুঃখ ভোগ করিতেছেন, দুঃখ দিতেছেন?

৩

একজন মহিলা বারান্দায় আসিলেন। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ; ধবধবে ফরসা রঙ, মেদ-বহুল দেহ, চিবুকের নীচে থাক পড়িয়াছে, ভারী ভারী মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমা; সীমন্তে ডগডগে লাল সিন্দুর-লেখা; পরনে টকটকে লালপাড় গরদের শাড়ি; হাতে ঝকঝকে সোনার চুড়ি ও শাখা, গলায় বিছাহার। ইনি মালবিকা, রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী।

গৃহিণী পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাতে একখানা চিঠি। কটাক্ষে স্বামীর কোলে ন্যস্ত চিঠিটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হ্যাগা, এ চিঠিখানা পড়েছ?

রায় বাহাদুরের চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। একটু মৃদু চমক লাগিল দেহে। কোলের চিঠিটা মুড়িয়া সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন হ্যাঁ, পড়েছি। গৃহিণী কহিলেন এত দিন পরে বলছে, গয়নার টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, ওরা নিজে গড়াবে। দেখ দেখি, কি ফ্যাসাদ!

রায় বাহাদুর কহিলেন, ফ্যাসাদ আর কি! অজিতকে বল, টাকা পাঠিয়ে দিক। গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, পাঠিয়ে দিক ব'লে দিলেই হ'ল! আমি স্যাকরাকে ডেকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, বায়না দেওয়াও হয়ে গেছে, সে হয়তো তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—

তা কি করবে? ওরা হচ্ছে বরপক্ষ, উঁচু পিঁড়ে ওদের, যা বলবে তাই করতে হবে আমাদের। গয়না যদি কিছু তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে নিলেই হবে; বাকিটা নিষেধ ক'রে দাও।

গয়না নিয়ে আমরা কি করব? ওরা তো ফর্দে তা বাদ দেবে না।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লই বা, আর এক পদ না হয় বেশিই দেবে মেয়েকে। তাতে ওরা গয়রাজি হবে ব'লে মনে হয় না। গৃহিণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, আমারও মনে হয় না, মুখ্যু মেয়েমানুষ হ'লেও। বেশি পেলে কেই বা গয়রাজি হয়! কিন্তু কেন বেশি দোব? ওরা তো দুয়ে নিতে কসুর করছে না!

রায় বাহাদুর মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, তবে বউমাকে দেবে। মোট কথা, ওরা যখন বলেছে, তখন টাকা পাঠিয়ে দিতে আপত্তি করলে চলবে না। আর দিনও তো স্থির ক'রে দিয়েছে, আসছে মাসের দোসরা। এক মাস সময়ও নেই। অজিতকে বল তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করতে। গৃহিণী কহিলেন, অজিতের ওপরে সব ভার দিলে চলবে কেন? তুমি কি করবে? বানপ্রস্থ নেবে নাকি?

রায় বাহাদুর জবাব দিলেন না।

গৃহিণী কহিলেন, ও চিঠিখানা কার দেখলুম?

রায় বাহাদুর কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কোন চিঠি?

ওই যে তাড়াতাড়ি সরিয়ে রাখলে।—বলিয়া একটুকরা ধারালো হাসি হাসিলেন গৃহিণী। এতক্ষণে রায় বাহাদুরের যেন মনে পড়িল, কহিলেন, আমার এক বন্ধুর চিঠি। গৃহিণী শ্লেষের সহিত কহিলেন, মেয়েমানুষের হাতের লেখা দেখলুম যেন! তোমার কোন মেয়েমানুষ বন্ধু আছে জানতুম না।

রায় বাহাদুরের মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল; কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু

চাপিয়া দিয়া কহিলেন, বন্ধুর নয়, বন্ধুর মেয়ের চিঠি। পরক্ষণেই পরম গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া ভারী গলায় কহিলেন, পরে বলব এখন।

এই গাম্ভীর্যকে মালবিকা ভয় করেন। রায় বাহাদুর যখনই কোন আলোচনা অপছন্দ করেন, তখনই এই গাম্ভীর্যের কঠিন খোলের মধ্যে আত্মগোপন করেন। শত চেষ্টাতেও মালবিকা তাঁহার নাগাল পান না।

মুখ গম্ভীর করিয়া মালবিকা অন্দরে চলিয়া গেলেন।

দুপুরে আহারের সময় রায় বাহাদুরের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া মালবিকা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কি ভাবছ এত? সেই চিঠির কথা বুঝি? কার চিঠি বললে না তো?

রায় বাহাদুর অন্যমনস্কতার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এক মুহূর্তে; খাদ্যবস্তুর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়া সোৎসাহে খাইতে শুরু করিয়াই থামিয়া কহিলেন, হ্যাঁ—চিঠিটার কথা—জরুরী চিঠি। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কার চিঠি?

বলব, খাওয়া-দাওয়ার পরে আমার ঘরে এস।

কার চিঠি এখন বলতে দোষ আছে কি?

রায় বাহাদুর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া মৃদু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, বলছি যে, একটু পরে বলব।

সংসারের সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিলে মালবিকা রায় বাহাদুরের ঘরে গেলেন। তেতলার একটি মাত্র ঘর, এই ঘরে রায় বাহাদুর শয়ন করেন। মালবিকা শয়ন করেন দোতলার একটা ঘরে, পৌত্র-পৌত্রীপরিবৃতা হইয়া। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও রায় বাহাদুর সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকেন। সংসারচালনার সম্যক দায়িত্ব মালবিকার হাতে। প্রতি মাসে পেন্‌শন পাইলেই ছোট ছেলেকে যাহা পাঠাইতে হইবে পাঠাইয়া দিয়া বাকি টাকা রায় বাহাদুর গৃহিণীর হাতে দেন। অজিতও তাহার সমস্ত উপার্জন তাহার মায়ের হাতে তুলিয়া দেয়। মালবিকা সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া খরচ করেন। সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে তিনি পুত্র ও পুত্র-বধূর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর কখনও কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। অবশ্য কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাওয়া হইলে, তিনি দেন। তবে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ হইল কি না হইল, তাহা জানিবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না।

রায় বাহাদুর বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। মালবিকার পদশব্দে চোখ মেলিয়া কহিলেন, কে? ওঃ, তুমি! এস, ব'স।—বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। মালবিকা তাঁহার কাছ হইতে একটু দূরে বসিলেন। বালিশের নীচ হইতে চিঠিটি বাহির করিয়া

রায় বাহাদুর চিঠিটি মালবিকার হাতে দিলেন। মালবিকা চিঠি খুলিয়া পড়িতে শুরু করিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

মালবিকা চিঠি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে প্রথমে ফুটিল বিস্ময়, তারপর ব্যঙ্গের বাঁকা হাসি, তারপর বিরক্তির ভ্রূকুটি। চিঠিটি পড়িয়া রায় বাহাদুরের সামনে ফেলিয়া দিয়া মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, কিছু বললে না? মালবিকা ভারী গলায় কহিলেন, আমাদের একটা চাকর চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়েছিল; অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে রাস্তার লোকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, জ্ঞান হবার পরে হাসপাতালের লোকেরা তাকে আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে, সে বাবার ঠিকানা দিয়েছিল। তাকে দেখতে বাবার জন্যে হাসপাতাল থেকে বাবাকে খবর পাঠিয়েছিল—

রায় বাহাদুর কহিলেন, তোমার বাবা কি করেছিলেন?

যান নি। চুরি ক'রে পালাবার পরও যেমন খোঁজখবর করেন নি, যা যাবার গেছে ব'লে চুপ ক'রে ছিলেন, এখনও তেমনই মহত্ত্ব দেখাবার লোভে ছুটে যান নি। ভগবান যখন অপরাধীর শাস্তির ভার নিজের হাতে নেন, তখন সেখানে হাত লাগাতে যাবার চেষ্টা করা মানুষের বোকামি—এই ছিল তাঁর মত।

রায় বাহাদুর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তা হ'লে কি করতে বল আমাকে?

মালবিকা কহিলেন, তুমি চিঠির কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক। আর যদি কিছু করতেই চাও তো, লিখে দাও, যে মেয়ে সংসার থেকে, সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কিঞ্চিৎ কড়া গলায় কহিলেন, বেশ্যাবৃত্তি করে নি; বিধিসঙ্গত-ভাবে বিয়ে হয়েছিল ওদের—

এক ফোঁটা তীক্ষ্ণ কুটিল হাসি মালবিকার অধরোষ্ঠে কুঞ্চনাভাস জাগাইয়াই মিলাইয়া গেল। বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, বিয়ে! একে তুমি বিয়ে বল নাকি? এই রকম বিয়েই তুমি দিয়েছ এক মেয়ের, আর দিতে যাচ্ছ আর এক মেয়ের? গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, তা কি করতে চাও শুনি?

ওকে নিয়ে আসতে চাই।

নিয়ে এসে কোথায় রাখবে? এই বাড়িতে?—বলিয়া মালবিকা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রায় বাহাদুরের মুখের উপর কেন্দ্রিত করিলেন।

রায় বাহাদুর একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, দোষ কি? নীচের তলায় একটা ঘরে—

মালবিকা বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, কি বলছ? দোষ নেই? এই বয়সেই

ভীমরতি ধ'রে গেল নাকি তোমার? আঁস্তাকুড় থেকে ওই এঁটো মেয়েকে বাড়িতে এনে তুলবে? দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরোহিত নিয়ে হিন্দুর সংসার; বারো মাসে তেরো পার্বণ; কেউ আসবে তোমার বাড়িতে? শহরে তোমার এত সম্মান, কি মনে করবে সবাই? সম্ভ্রান্ত ঘরে কুটুম-কুটুম্বিতে করেছ, শুনলে তারা কি বলবে? তা ছাড়া হাতে হাতে ছোট খুকীর বিয়ে; নানা জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব এসে জড় হবে। এ মেয়ে ঘরে আছে জানলে কেউ যে তোমার বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করবে না। তা ছাড়া এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে খুকীর বিয়েই বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এখনকার মত নয়, চিরজন্মের মত। যে বাড়িতে বেশ্যা বাস করে, সে বাড়ির মেয়ে নেবে কেন লোকে? যে মেয়ে কারও মুখের দিকে তাকালে না, নিজের খেয়াল মেটাবার জন্যে যার-তার হাত ধ'রে বেরিয়ে যেতে পারলে, তারই জন্যে আর এক নির্দোষী মেয়ের জীবন পণ্ড ক'রে দেবে? পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক আছে, আমার বাপের বাড়ির বংশ অকলঙ্ক; সেই বংশের মেয়ে হয়ে এই অ-হিন্দুয়ানি আমি সহ্য করব না।

রায় বাহাদুর কহিলেন, হিন্দুয়ানির কথা আর না বলাই ভাল; ছেলেকে তো বিলেত পাঠিয়েছ।

মালবিকা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, তা পাঠাতে হয়েছে। ছেলে ঝুঁকে পড়ল, না পাঠালে কি অনর্থ ক'রে বসে ভেবে পাঠিয়েছিলুম। আজকাল অনেক ছেলেই যাচ্ছে। ম্লেচ্ছের দেশে গিয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে যা পাপ হবে, শাস্ত্রে তার শোধনের ব্যবস্থা আছে। দাদা বলেছেন, প্রায়শ্চিত্ত করলেই আর কোন দোষ থাকবে না।

রায় বাহাদুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া আবার নিবিয়া গেল। ধীরে ধীরে কহিলেন, বাইশ বৎসরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কোন্ হিন্দুশাস্ত্রের বিধান?

ঝঙ্কার দিয়া মালবিকা কহিলেন, সে কি আমার দোষ, না তোমার? বড় খুকীর বিয়ের সময়ে বাবা বেঁচে ছিলেন; চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ভাল ছেলে যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। বারো বছরে পড়তে না পড়তেই ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। ছোট খুকীর বিয়ের জন্যে তো কতদিন থেকে বলেছি তোমায়; তুমিই গা কর নি।

ইহা সত্য। একটি মেয়েকে তিনি তাঁহার আদর্শমত মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজে পড়াইয়া তাহাকে বি. এ. পাস করাইয়াছেন। সন্তানদের মধ্যে এই মেয়েটি তাঁহার সকলের চেয়ে প্রিয়।

রায় বাহাদুর কহিলেন, যদি সুজিত বিলেত থেকে মেমসাহেব বিয়ে ক'রে ফেরে?

মালবিকা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; তারপর অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, বাপ হয়ে ছেলের এই অকল্যাণ কামনা করছ তুমি?

রায় বাহাদুর একটু অপ্রতিভ হইলেন ; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, অনেকে করেছে তো ! নজির আছে।

মালবিকা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, যদি সেই সর্বনাশ করে সে, তো তার মুখ দর্শন করব না আমি। আর একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে—যদি সেই মেয়েটাকে ঘরে ঢোকাও তো মেয়ে, বউ, নাতি-নাতনীকে নিয়ে আমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। অজিত আমার মানুষ হয়েছে, আমাদের খেতে পরতে দেবার ভার সে নিতে পারবে।

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, চিরদিন ওই ভাব তোমার ; আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদের কোনদিন নিজের ব'লে ভাবতে পারলে না ; চিরদিন মুখপুড়ীরা পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

রায় বাহাদুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহা মালবিকার চিরন্তন অনুযোগ। এই অভিমানে বহুবার কাঁদিয়াছেন মালবিকা। পূর্বে মালবিকা যখন তন্বী, তরুণী ছিলেন, রায় বাহাদুর তাঁহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। এখন সে প্রক্রিয়া অচল। কয়েক বৎসরের মধ্যে মালবিকা এমনই ভরাট হইয়া উঠিয়াছেন যে, বাহুবন্ধনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তবে মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়া চলে। রায় বাহাদুর প্রস্তুতও হইলেন। কিন্তু মালবিকা তাঁহাকে অবসর না দিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রে আহারাদির পর, শয়নকক্ষের সামনে খোলা ছাদে একটা ঈজিচেয়ারে রায় বাহাদুর বসিয়া ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস ; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ; ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে ; পরিষ্কার আকাশ তারায় সমাকীর্ণ। পূর্বাকাশে বৃশ্চিকরাশি সুদীর্ঘ বঙ্কিম পুচ্ছ লইয়া বিরাজ করিতেছে ; ঠিক মাথার উপরে বৃহস্পতি স্থির প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ; তাহার ঠিক পাশেই একটি নীলাভ তারা ; উত্তর দিক ঘেঁসিয়া দীপ্ত-দেহ সপ্তর্ষি সপ্ত আসনে ধ্যানমগ্ন।

রায় বাহাদুরের অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাব, সম্মুখে গুরুতর সমস্যা। এক দিকে সমাজ সংসার, আর এক দিকে গৃহত্যাগিনী সমাজ-পরিত্যক্তা রুগ্না মৃত্যুতীরবর্তিনী কন্যা। কি করিবেন তিনি ? সংসার ও সমাজকে শিরোধার্য করিয়া কন্যার প্রতি বিমুখ হইবেন ? সংসারের সহিত তিনি তো একরকম সম্পর্কহীন। বাঁচিয়া আছেন বলিয়া সংসারের একজন হইয়া আছেন। যদি হঠাৎ মরিয়া কিংবা সরিয়া যান, সংসারের একটা অনাবশ্যক অঙ্গ খসিয়া পড়িবে মাত্র ; সংসারের তিলমাত্র ক্ষতি হইবে না। তাহাতে সংসারের প্রতি কর্তব্যও তাঁহার সমাপ্তপ্রায়। বড় ছেলেটি উপযুক্ত হইয়াছে। বড় মেয়েটিকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন, ছোট মেয়েটির বিবাহ আসন্নপ্রায় ; সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ঘরে বিবাহ হইতেছে। খরচপত্র যাহা হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছেন। ছোট ছেলেটির বিদেশ হইতে ফিরিতে দেরি নাই। না ফিরা পর্যন্ত খরচ, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তিনিই চালাইয়া দিবেন। তাঁহার অবর্তমানে স্ত্রীর যাহাতে কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি। টাকাকড়ি, গহনাগাঁটি যথেষ্ট তাঁহার আছে। তাহা ছাড়া, তাঁহার মৃত্যুর পরে জীবন-বীমার টাকা তিনিই পাইবেন। কাজেই, পুত্র ও পুত্রবধূদের নির্জলা ভক্তি ও ভালবাসা আমরণ পাইতে পারিবেন। সমাজের সঙ্গেও সংযোগ রাখিয়া চলিবার আর তাঁহার প্রয়োজন নাই। জীবনে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম প্রায় শেষ করিয়াছেন। যাহা বাকি আছে, তাহা তাঁহাকে বাদ দিয়াও হইতে পারিবে। জীবনে একটি বিশেষ ব্যাপার অবশ্য বাকি আছে, তাঁহার মৃত্যু। এই ব্যাপারে সমাজ ও সংসার দুইয়েরই প্রয়োজন হয়। না হইলে অসুবিধা হয়। অবশ্য আজকাল পয়সা খরচ করিতে পারিলে, সংসার ও সমাজের বাহিরেও রাজার হালে মরা যাইতে পারে ; এমন কি শ্মশানযাত্রার সময়ে শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

বড় ছেলে অজিত আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, আমায় ডেকেছেন ? রায় বাহাদুর চিন্তার জাল-বোনা স্থগিত রাখিলেন। কহিলেন, হ্যাঁ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বহরমপুরের চিঠির কথা শুনেছ ? গয়না ওরা নিজেরা গড়াবে ; টাকা পাঠিয়ে দিতে বলেছে ; কাল সব টাকা পাঠিয়ে দিও ; বিয়েরও দেরি নেই বেশি ; এখন থেকে আয়োজন আরম্ভ ক'রে দাও। একটু থামিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা কথা—। বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অজিত ইতিমধ্যে মা ও স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়াছিল। পরামর্শ-সভাও বসিয়াছে। কিংকর্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে।

রায় বাহাদুর একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, একটা চিঠি এসেছে আজ। অজিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর একবার আড়চোখে তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন, তারপর কহিলেন, চিঠিটার কথা কিছু শুনেছ নাকি ? অজিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ। রায় বাহাদুর কহিলেন, কি কর্তব্য বল দেখি ? অজিত কহিল, মার মত নেই।

জানি। বউমার কি মত ?

ওরও মত নেই।

রায় বাহাদুর অজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তোমার কি মত ?

অজিত কহিল, উনি যে-ভাবে গেছেন, তাতে হিন্দুর সংসারে ওঁকে আশ্রয় দেওয়া চলে না, ওঁরও আশ্রয় চাওয়া উচিত নয়। উনি নিজে হাতে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক

কেটেছেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের কোন যোগ নেই। কাজেই এতদিন পরে জোর ক'রে ওঁকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া অন্যায় হবে। জোড়া তো লাগবেই না; উলটে সংসারে অশান্তি হবে, সমাজে অসম্মান হবে, এমন কি ছোট খুকীর বিয়েতেও বাগড়া প'ড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, ওই রোগ ও রোগীকে—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কহিলেন, কোন বাড়ি ভাড়া ক'রে—

অজিত বাধা দিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি পাবেন শহরে? কত সরকারী চাকরেই বাড়ি পাচ্ছে না, এডালে ওডালে কাটাচ্ছে। একট চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া শহরে রাখাও চলবে না। আজ না হয়, দুদিন পরে আসল ব্যাপার শহরের লোক জানতে পারবে, তখন শহরে মুখ দেখানো দায় হবে।

রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা বটে, কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, দেখ, ওদের আইনসঙ্গত বিবাহ হয়েছিল।

অজিত কহিল, কে বললে?

চিঠিতে লিখেছে।

ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে অজিত কহিল, ওঃ। রায় বাহাদুর অজিতের মুখের দিকে তাকাইলেন। অজিত তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়াই কহিল, হ'লেও সমাজ তা গ্রাহ্য করবে না। রাজার আইন সমাজ মানতে বাধ্য নয়।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া শ্লেষের স্বরে কহিলেন, সতীদাহ-প্রথাটা বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়; বাল্য-বিবাহ—

অজিত রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, বন্ধ হয় নি, পাড়াগাঁয়ে আগের মতই চলছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর মসৃণ করিয়া কহিল, মোট কথা হচ্ছে এই, সমাজ জড়বস্তু নয়, তার মন আছে; সেই মনের সায় না থাকলে কারও আইন সমাজে চলে না, তিনি রাজাই হোন, আর যাই হোন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সমাজের মন তো পশুর মন, সংস্কারসর্বস্ব, বিচার-বুদ্ধিহীন। পশুর মত সাবেক চালেই চলতে চায়। চাল বদলানো যায়, হয় ভয় দেখিয়ে অথবা সমাজের অধিকাংশের বিচার-বুদ্ধি জাগিয়ে। দুই-ই করতে পারে রাজশক্তি। কিন্তু রাজা আমাদের সমাজের নয়। কাজেই সমাজের ভাল-মন্দর প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই। আর সমস্ত সমাজের বিচার-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলা তো তাঁর স্বার্থের পরিপন্থী—

অজিত কহিল, যারা শিক্ষিত, যাদের বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত, তারাও তো প্রাচীন পথেই চলেছে। রায় বাহাদুরের বলিতে ইচ্ছা হইল, চলা উচিত নয়; বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যা ভাল মনে করি, তা যদি না করতে পারি, তা হ'লে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ; কিন্তু চাপিয়া গেলেন। মনে পড়িল, সারাজীবন তিনি নিজে কি করিয়াছেন।

অজিত কহিল, না চ'লে উপায় নেই। আর চলাই তো ভাল। এই পথে চ'লেই তো আমরা সুখ-শান্তি পেয়েছি একদিন—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কহিলেন, সবাই পেয়েছে কি?

অজিত জোরের সহিত কহিল, নিশ্চয়। না হ'লে সমাজে বিপ্লব বেধে যেত।

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, আবহমানকাল পাঁঠা-বলি হয়ে আসছে; পাঁঠাদের বিদ্রোহ করতে দেখেছ? পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তর্ক থাক্, সমাজ যা ইচ্ছে করুক; সমাজের সঙ্গে কারবার আমার চুকে গেছে। আমি সুমিত্রাকে নিয়ে যদি সমাজের বাইরে গিয়ে থাকি—

রায় বাহাদুর পেন্‌শনভোগী পিতা, পুত্রদের অত্যন্ত ভক্তি ও প্রীতির পাত্র। রায় বাহাদুরের স্থানান্তরে যাওয়া মানে—পেন্‌শনটার হাতের নাগালের বাহিরে যাওয়া। পিতৃ-বিরহ সহ্য করা যায়, কিন্তু পেন্‌শন-বিরহ অসহ্য। তাহা ছাড়া সুজিত ফিরিয়া আসিলেই পেন্‌শনটা পুরাপুরি সংসারের তহবিলে ঢুকিবে। অজিত ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ও কাজ করবেন না বাবা। অসামাজিক কাজ ব'লেই নয়, ও রোগটা বড় ছোঁয়াচে। কাছাকাছি থাকলে আপনাকেও ধরতে পারে। তার চেয়ে বরং কিছু টাকা পাঠিয়ে দিন তাঁকে, সেখানে থেকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করান। তারপর, না হয় মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা যাবে। নেহাত বনে-জঙ্গলে তো প'ড়ে নেই—

রায় বাহাদুর নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজিত দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, আচ্ছা যাও, আমি ভেবে দেখি। অজিত চলিয়া গেল।

৪

রাত্রে নিদ্রা আসিল না। পালঙ্কের উপর শুভ্র কোমল শয্যা; বিলাতী নেটের মশারি, মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। চোখের পাতা ক্লান্তিতে ভারী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিলেই নানা চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিল করিয়া উঠিতেছে; ঘুম আসিতেছে না। বিছানা হইতে উঠিয়া রায় বাহাদুর ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রাকে তিনি কোথায় আশ্রয় দিবেন? তাঁহার বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না। সে যদি অসামাজিক আচরণ না-ও করিত, তাহা হইলেও দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য তাহার স্থান হইত না। তাঁহার গ্রামের বাড়ি বেশ বড়। একাংশে তাঁহার এক পিসতুতো বোন স্বামী-পুত্র লইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে তাহাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা মিলিটারির কবলে গিয়াছে। যুদ্ধ মিটিয়া গেলেও এখনও কিছুই তাহারা ফেরত পায় নাই।

এই কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি তাহাদের আশ্রয় ও আহার্য, দুইই যোগাইয়া

আসিতেছেন। বাড়ির বাকি অংশটাতে সুমিত্রাকে লইয়া তিনি বাস করিলে, উহারা সুমিত্রার পরিচয় জানিতে পারিলেও আপত্তি করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু আপত্তি করিবে পল্লী-সমাজ। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও অজিতের মন ও মত যদি এত সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকদের কাছ হইতে উদারতা কি করিয়া আশা করা যায়? মোট কথা, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেই সনাতন বাঁধা রাস্তার পথিক। পুরাতন পথের মোহ সকলের রক্তে মিশিয়া আছে; নূতন পথে চলিবার সাহস কাহারও নাই। যাহারা বাহিরে নিজেদের নবীন বলিয়া জাহির করে, তাহারাও অন্তরে লোলচর্ম বৃদ্ধ। তিনি নিজেই বা কি? আজ সংসারের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়াছেন বলিয়া সুমিত্রাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিতেছেন। কিন্তু দশ বৎসর আগে হইলে কি পারিতেন? সুমিত্রার সঙ্গে পাছে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে তো একদিন তিনি পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

কাজেই সংসারের বা সমাজের চোখের সামনে সুমিত্রাকে আশ্রয় দিলে ঘরে-বাহিরে অশান্তি অনিবার্য। তাহাকে লইয়া তাঁহাকে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রতিবাদ করিবে, এই অসামাজিক কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাঁহাকে নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে হইবে। হতভাগিনী কন্যার জীবনের শেষ দিনগুলিকে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া মধুর করিয়া তুলিতে হইবে।

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর দুইটি চিঠি লিখিলেন। একটি সুমিত্রাকে, সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিলেন—কাহাকেও সঙ্গে করিয়া ষ্টীমার-ষ্টেশনে এস, আমি নিজে যাইয়া লইয়া আসিব।

আর একটি চিঠি সরসীবাবুকে। সরসীবাবু তাঁহার বন্ধু। মুনসেফি করিতেন; এখন পেন্‌শন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। কাশীতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, সুমিত্রার সকল ব্যাপার তিনি জানেন।

লিখিলেন, সুমিত্রা এতদিন পরে ফিরিয়া আসিতে চায়। আমি ছাড়া আপনার বলিতে কেহ তাহার নাই, আমার আশ্রয় ছাড়া আশ্রয়ও নাই। তা ছাড়া নিদারুণ ক্ষয়রোগে তাহার জীবন ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে; মৃত্যুর আর দেরি নাই। আমার বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না। কাজেই তাহাকে লইয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাই। বিশ্বেশ্বরের চরণতলে শেষের দিন কয়টা কাটাইতে পারিলে সে বোধ হয় শান্তি পাইবে। তা ছাড়া তুমি সেখানে আছ, তোমার কাছে সাহস ও সাহায্য দুইই পাওয়া যাইবে। সেইজন্য তাহাকে লইয়া কাশী যাওয়াই স্থির করিয়াছি। তুমি যেমন করিয়া হোক, যত তাড়াতেই হোক আমাদের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিও।

৫

দিন করেক পরে রায় বাহাদুর গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসন্নপ্রায় বিবাহের ব্যবস্থায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, খাবার সময়ে স্বামীর কাছেও সব দিন বসিবার সময় পান না। এক সময়ে আসিয়া দেখা করিলেন। রায় বাহাদুর কহিলেন, কাল আমি যাব স্থির করেছি। গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন; দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, সে কি! কোথায়? রায় বাহাদুর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সুমিত্রাকে আনতে।

গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন; সবিস্ময়ে কহিলেন, বল কি! এখানে আনবে তাকে?

এখানে নয়। কাশীতে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করেছি। সেখানে নিয়ে যাব।

গৃহিণী করুণ কণ্ঠে কহিলেন, দু দিন পরে ছোট খুকীর বিয়ে। তুমি চ'লে গেলে লোকে বলবে কি? আমরাই বা কি বলব তাদের?

ব'লো শরীর অসুস্থ, কোথাও বেড়াতে গেছি।

খুকীর বিয়েতে থাকবে না তা হ'লে? সেই মাগীই তোমার কাছে বড় হ'ল?

রায় বাহাদুর চুপ করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, ওই সর্বনেশে রোগ ঘাঁটাঘাটি ক'রে তোমার যদি কিছু হয়?

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, হ'লই বা; আমার বাঁচবার আর দরকার কি?

গৃহিণী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, তাই নাকি? আমার কথা ছেড়ে দাও। দুটি খেতে পরতে দিয়ে দাসীবৃত্তি করাবার জন্যে বিয়ে ক'রে এনেছিলে। সারাজীবন ধ'রে তোমার সংসারে তাইই করেছি। এর পর না হয় ছেলেদের সংসারেও তাই করব। আর বউদের পছন্দ না হয় তো, কারও বাড়িতে রাঁধুনীগিরি করতে পারব। একটা পেট তো, কোন রকমে চ'লে যাবে। কিন্তু তোমার ছোট ছেলের ব্যবস্থা কি হবে? সে কি চিরদিন বিদেশে প'ড়ে থাকবে?

রায় বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সুজিতের পড়া তো শেষ হয়ে গেছে; ফিরে আসতে দেরি নেই। এক বছরের মধ্যে আমার কিছু না হয় তো আমিই তার খরচ চালিয়ে দেব। আর যদি হয় তো, ভাবনা কিসের? আমার লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের পলিসিটা তোমার নামেই আছে। মারা গেলেই পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে যাবে। তাতে সুজিতের খরচ চ'লে যাবে, তোমারও সারাজীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে চ'লে যাবে। গৃহিণী এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন; রায়বাহাদুরের কথা শেষ হইতেই ঝাঁজের সহিত কহিলেন, না, আর কোন ভাবনা নেই। এত টাকা রেখে যাবে আমার জন্যে। সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে, তোমার টাকা নাড়াচাড়া ক'রে সুখের আমার সীমা

থাকবে না। কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন, তোমাকে ভাল কথা বলছি আমি। ওসব মতলব ছাড়। যদি বাড়ি থেকে এক পা বেরোও তো বিষ খাব আমি।

রায় বাহাদুর সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, পাগল! বিষ খাবে কি দুঃখে? এই ভরা সংসার তোমার, ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী। হাতাহাতি মেয়ের বিয়ে—

গৃহিণী উত্তর করিলেন, আমার একলার নাকি? তুমি আছ ব'লেই আমার সংসার; তুমি না থাকলে কার কি?

রায় বাহাদুর কহিলেন, আমি কি চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছি যে, এমন করছ তুমি! সুমিত্রা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই আমাকে থাকতে হবে।

গৃহিণী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, কেন থাকতে হবে? কে তোমার সে? কি সম্পর্ক রেখেছে তোমার সঙ্গে? কোনদিন একটা চিঠি দিয়ে খবর নিয়েছে কি? কোনদিন মাপ চাইবার চেষ্টা করেছে কি? আজ দুর্দশায় পড়েছে ব'লে বাবাকে মনে পড়েছে।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সে যাই ক'রে থাক্, আমি তো তার বাবা। সে যখন আসতে চেয়েছে, আমি 'না' বলব কি ক'রে? তোমার যদি সে নিজের মেয়ে হ'ত তুমিই কি বলতে পারতে?

গৃহিণী কটুকণ্ঠে কহিলেন, আমার মেয়েদের এমন শিক্ষা আমি দিই নি যে, তারা এমন কাজ করবে। যা-তা কথা ব'লো না তুমি।

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, আমাকে বাধা দিও না। কোন গোলমালও ক'রো না। পাঁচ কানে কথাটা উঠলে ছোট খুকীর বিয়েতে গোলমাল বাধতে পারে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ব'লো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প'ড়ে চেঞ্জে গেছি আমি—

গৃহিণী কহিলেন, তাই লোকে শুনবে নাকি? অসুখ হ'ল, ডাক্তার-কবরেজ জানলে না, বন্ধু-বান্ধবরা জানলে না—

কোথাও গিয়েও তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

গৃহিণী ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? যা সত্যি তাই ব'লে দেব। বলব, যে মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করেছে সারাজীবন, তাকে তুমি স্থান দিয়েছ, তার জন্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়েছ। বিয়ে বন্ধ হয় হোক, সমাজে কলঙ্ক হয় হোক, আমার ব'য়ে গেল।

উদাস সুরে রায় বাহাদুর কহিলেন, বেশ, যা ভাল মনে হয় করবে।

গৃহিণী সতেজে কহিলেন, কেন করব না? তোমারই যখন সংসারে কারও ওপর মায়া নেই, আমার কিসের মায়া? যা ইচ্ছে করগে তুমি, কিছু বলব না আমি। আমার যা ইচ্ছে করব, কিছু বলতে এস না।— বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে অজিতের সহিত কথাবার্তা হইল। অজিত কহিল, আপনার এখন কোথাও যাওয়া হতে পারে না বাবা। মাথার ওপর বিয়ে। আমি একা সামলাতে পারব না।

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, সামলাতে না পারলে চলবে কেন? আমি যদি না থাকতাম? তোমার মা রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব করবে।

খরচপত্র যদি বেশি হয়ে যায়?

কোন চিন্তা নেই। চেক-বই সই ক'রে দিয়ে যাব তোমার মায়ের কাছে। যা দরকার হয় বের করবে। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সংসারের ওই কাজটিই তো করি, আর তো কিছু করি না।

অজিত কহিল, যাবার আপনার কি দরকার? টাকাকড়ি কিছু পাঠিয়ে দিন।

টাকাকড়ি তো সে চায় নি।

কি চেয়েছে তবে?

রায় বাহাদুর কহিলেন, আমার কাছে থেকে মরতে চেয়েছে। জীবনে তো তাকে কিছুই দিই নি, এটুকু দিতে কার্পণ্য করি কি ক'রে, বল?

অজিত কহিল, একদিন যে এ অবস্থা হবে, সেটা বুঝে ও পথে পা দেওয়া তাঁর উচিত ছিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, এ অবস্থা হবে না, স্বামী-পুত্রের কোলে মাথা রেখে যেতে পারবে, এই ভেবেই ও পথে গিয়েছিল সে। ভাগ্য বিমুখ হ'লে কে কি করবে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ও পথে পা না দিয়েও তো আমাদের সংসারে হাজার হাজার মেয়ে জীবন্ত মরছে।

অজিত কহিল, এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে ছোট খুকীর বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো।

যাতে জানাজানি না হয় তার ব্যবস্থা ক'রো। উপায় তোমার মাকে ব'লে দিয়েছি।

অজিত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, শুনেছি। খুকীর বিয়ের পরে তো চুপ ক'রে থাকতে পারব না, বিবেকে বাধবে।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিলেন। অজিত ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, খুকীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে থাকতে হবে দিন কয়েক। একজনের অন্যায়ের জন্যে সে কেন ভুগবে মিছিমিছি? পরে কিন্তু শ্বশুর মশায়কে জানাতেই হবে।

রায় বাহাদুর কহিলেন, ওঃ! তোমার শ্বশুর যে সনাতন-হিন্দু সভার একজন চাঁই, ভুলে গিয়েছিলাম। তা বেশ তো, জানিও, তিনি যা বলবেন তাই করবে।

রূঢ় কণ্ঠে অজিত কহিল, আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে তিনি নিশ্চয় নিষেধ করবেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, বেশ তো, রেখো না।

অজিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কোথায় গিয়ে উঠবেন ?

সরসীকে চিঠি লিখেছি কাশীতে একটা বাড়ির জন্যে।

অজিত কহিল, বাড়ি তো পাওয়া যাবে না, সরসীকাকা লিখেছেন।

বিস্ময়ের স্বরে রায় বাহাদুর কহিলেন, তাই নাকি ? আমাকে তো কিছু লেখে নি !

অজিত কহিল, না, আপনাকে আর লেখেন নি। আমাকেই লিখেছেন, আপনাকে জানিয়ে দিতে ; আপনাকে এ বয়সে এ কাজ করতে নিষেধও করেছেন।

গভীরতর বিস্ময়ে রায় বাহাদুর কহিলেন, বল কি ! সরসী নিষেধ করেছে ! প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর একজন ব্রাহ্ম বিধবাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল সে, অনেক কষ্টে আটকিয়েছিলাম আমরা। হঠাৎ এত পরিবর্তন হ'ল কি ক'রে ?

পরম আত্মপ্রসাদের সহিত অজিত কহিল, আমার শ্বশুর মশায়ের সম্পর্কে এসে। কাশীতে দুজনে দেখা হয়েছিল। তারপর থেকেই আমাদের সভায় তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য, আমাদের পত্রিকার সম্পাদকও।

রায় বাহাদুর চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হোক, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন।

অজিত কহিল, দেখবে শুনবে কে ? একা পারবেন ?

একাই পারতে হবে ; এ ভার তো আমার একার।

আপনার যদি নিজের অসুখ হয়, দেখবে কে তখন ?

হাসপাতালে নার্স। রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, সে জন্যে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। যেতে আমাকে হবেই। সারাজীবন ধ'রেই তো তোমাদের জন্যেই ক'রে এসেছি। এই কটা দিন আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছে হয় রেখো, না হয় রেখো না ; অসুখ-বিসুখ হ'লে ইচ্ছে হয় খবর নিও, না হয় নিও না। তর্ক ক'রে ভয় দেখিয়ে কিছু লাভ হবে না, আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। তোমাদের সংসার আমি গুছিয়ে দিয়েছি। আমার অভাবে তোমাদের কষ্ট হবে না। ছোট খোকার ব্যবস্থাও করব। কালই আমি যেতে চাই। আচ্ছা, যাও এখন।

অজিত বাবার মুখের দিকে তাকাইল। অনেক দিন এ রকম মুখের চেহারা দেখে নাই সে ; পাথরের মত শক্ত, আসন্ন ঝড়ের আগে আকাশের মত থমথমে। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৬

বাড়ির সকলেই নন-কো-অপারেশন করিল। গৃহিণী কথাবার্তা বন্ধ করিলেন। খাবার সময়েও অনুপস্থিত। ছোট মেয়ে পুত্রবধূ দেখা হইলেই মুখ ভার করিয়া, চোখ

নামাইয়া সরিয়া পড়িতেছে। নাতি-নাতনীরা মাঝে মাঝে কাছে আসিত, তাহাদিগকেও নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে সম্ভবত। অজিতের দেখা-সাক্ষাৎ নাই। যে চাকরটা তাঁহার সেবার জন্য নির্দিষ্ট, তাহারও চাল-চলন কেমন এক ধরনের হইয়া উঠিয়াছে। নীরবে নিজের কাজ করে, কোন একটা কিছু করিতে বলিলে, হাঁ-না কিছুই না বলিয়া সরিয়া পড়ে, আর দেখা দেয় না। রায় বাহাদুর অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। নিজেই সব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—সর্বাগ্রে টাকার ব্যবস্থা। সুমিত্রার দাদুর দেওয়া টাকা তাঁহার কাছে জমা ছিল। হুকুম ছিল—যদি কোন দিন সুমিত্রা দুরবস্থায় পড়ে এবং তিনি খবর পান, তাহা হইলে সুমিত্রাকে সেই টাকা যেন দেওয়া হয়। টাকাটা ব্যাঙ্কে এতদিন সুদে খাটিতেছিল। তাহা হইতে আবশ্যকমত টাকা উঠাইয়া আনিলেন। কাশীতে বাড়ি পাওয়া যাইবে না জানিতে পারিয়াই পুরীতে তাঁহার পাণ্ডাকে চিঠি লিখিলেন। পাণ্ডার নাম শ্রীনাথ, পুরীতে বেশ নাম-ডাক আছে তাহার, করিত-কর্মা ব্যক্তি। লিখিলেন, যত টাকা ভাড়াই হোক, একটা বাড়ি ঠিক কর ; দু-চার দিনের মধ্যেই যাইতেছি, কোনমতে অন্যথা যেন না হয়। নিজেই বাক্স গুছাইলেন, বিছানা বাঁধিলেন। যৌবনের শক্তি জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইল তাঁহাকে। ভালই হইল। সামনে কঠোর দুঃখের দিন। কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। রুগ্না মেয়েকে আনা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা, সেবা, মৃত্যুর পরে সৎকার ও সদ্গতির ব্যবস্থা—সব একাই করিতে হইবে। বার্ধক্যের ভারে নুইয়া পড়িলে তাঁহার চলিবে কেন ?

অপরাহ্নে ট্রেন। গৃহিণীর কাছে চাকরের মারফৎ খবর পাঠাইয়াছিলেন। যাত্রার কিছু পূর্বে পাচকের হাতে খাবার আসিল। তিনি একা আহার সমাধা করিলেন। জামা-কাপড় পরিলেন। গাড়ির ব্যবস্থা আগেই করিয়াছিলেন। বাড়ির গাড়ির উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে করেন নাই। বাড়ি-সুদ্ধ সকলে যখন ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তখন হয়তো ঠিক সময়ে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবে না। বাক্স-বিছানা গাড়িতে তুলিবার জন্য নিজেই কুলি ডাকিয়া আনিলেন। চাকরকে বলিতে ইচ্ছা হইল না। যেন মেসের বাবু ; দেনা-পাওনা চুকাইয়া মেস হইতে বিদায় লইতেছেন ; কাহারও সহিত কোনদিন সত্য সম্পর্ক ছিল না, পরে থাকিবে না। যাবার আগে বোধ হয় কেহ দেখাও করিবে না। রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। গাড়ি আসিয়া পৌঁছানোর শব্দ পাওয়া গেল ; তারপরেই গাড়োয়ানের হাঁক-ডাকের শব্দ। কুলি আসিয়া বাক্স-বিছানা গাড়িতে তুলিবার জন্য লইয়া গেল। তিনিও যাইবার জন্য উঠিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, থমথমে মুখ, চোখ দুইটি ফোলা—কাঁদিতেছিলেন বোধ হয়। অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, তুমি সত্যি যাবে ?

রায় বাহাদুর ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছ।

আত্রীর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দেবে না? সকলের ছোট মেয়ে; সে কান্নাকাটি করছে যে।

অদৃষ্টে না থাকলে কি করব? কান্নাকাটি করতে মানা ক'রো। ওরা আজকালকার মেয়ে; বুঝিয়ে বললে বুঝবে। আমিই বলতাম, তা কাছেই এল না আর।

পকেট হইতে একটা চেক-বই বাহির করিয়া গৃহিণীর হাতে দিয়া কহিলেন, সই ক'রে দিয়েছি। যা দরকার হবে বার ক'রো। হ্যাঁ, আর একটা কথা, তোমাদের টাকা আমি কিছু নিই নি। খুকীর নিজের টাকা আছে জান তো, তাই নিয়ে চললাম।

গৃহিণী কহিলেন, কোথায় যাচ্ছ?

জানি না। কাশীতে লিখেছিলাম বাড়ির জন্যে; পাওয়া যায় নি। পুরীতে লিখেছি; পেলে সেখানেই যাব।

কবে ফিরবে?

বলতে পারি না। কি অবস্থায় আছে জানি না। যদি বেশি দিন না বাঁচে, সব শেষ হ'লে ফিরে আসতে পারি; অবশ্য নিজে যদি সুস্থ থাকি, আর তোমাদের কোনও অসুবিধা না হয়।

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, আমাদের অসুবিধে!

সামাজিক অসুবিধে। আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি, তা সমাজের চক্ষে অপরাধ। তার ওপর তোমার ছেলে সনাতন-হিন্দুধর্মধ্বজী শ্বশুরের জামাই। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না বলেছে।—বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, তা কি করবে? ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সমাজকে অসম্মান করবার তার জো কি?

রায় বাহাদুর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, সত্যি। নীরস কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, কাজেই ফেরার প্রশ্ন নিরর্থক। ছাড়াছাড়ি হতেই হবে। তবে ও নিয়ে মন খারাপ না করলেই পার। হ'তই তো একদিন। ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, গাড়ির সময় হয়ে এল। এবার যেতে হবে।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, তুমি যে এতদূর পাষাণ হ'তে পার, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।—বলিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরপদে আসিল আত্রেয়ী, বয়স বাইশ, ফরসা রঙ, ছিপছিপে গঠন, ধারালো মুখের ডৌল; ম্লানমুখে আনত-চোখে আসিয়া প্রণাম করিল। রায় বাহাদুর মাথায় হাত দিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। আত্রেয়ী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কবে আসবেন বাবা? রায় বাহাদুর তাহাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তুমি তো সব শুনেছ মা।

লেখাপড়া শিখেছ; বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে; বেশ ক'রে ভেবে দেখো, না গিয়ে আমার উপায় নেই।

আত্রেয়ী মুখ নামাইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া বাম হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল। রায় বাহাদুর কহিলেন, বিয়েতে যদি না আসতে পারি, কোনও দুঃখ ক'রো না। যেখানেই থাকি, আশীর্বাদ করব তোমাদের। পুত্রবধূ আসিয়া প্রণাম করিল; ধর্মধ্বজী পিতার মেয়ে; মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। প্রণাম করিয়া উঠিতেই রায় বাহাদুর কহিলেন, দাদু-দিদিদের দেখছি না! পুত্রবধূ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, বেড়াতে নিয়ে গেছে।

রায় বাহাদুর নামিয়া আসিলেন। গৃহিণী রায় বাহাদুরের খাটের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ সামনে দাঁড়াইয়া নীরব সান্ত্বনা জানাইতে লাগিল। আত্রেয়ী পাছু পাছু নামিয়া আসিল। গাড়িতে চড়িবার আগে রায় বাহাদুর আত্রেয়ীকে কহিলেন, তা হ'লে যাই মা। আত্রেয়ীর দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। রায় বাহাদুর কহিলেন, ছিঃ, কাঁদতে আছে কি! একটা ভাল ব্যবস্থা যদি ক'রে দিতে পারি তো আসব একবার, তোমাদের দেখে যাব। তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তাকে ব'লো।

আত্রেয়ী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয় এসো, বাবা। রায় বাহাদুর পরমস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইলেন।

৭

রায় বাহাদুর চলিয়াছেন। ঈ. বি. আর.-এর ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট কামরা; মৃদু আলোকে আলোকিত। জানালার ধারে একটি গদি-মোড়া বেঞ্চিতে নিজের বিছানাটি পাতিয়া রায় বাহাদুর শুইয়া আছেন। কামরায় অন্যান্য বেঞ্চিতে ও বাঙ্কে জনকয়েক লোক শুইয়া আছে। সকলেই নিদ্রিত। মাঝের বেঞ্চির সাহেবী-পোশাক-পরা লোকটির প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকিতেছে। গাড়ির মৃদু দোলায় শরীর দুলিতেছে। রায় বাহাদুর চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছেন না, কত কি ভাবিতেছেন।

কলিকাতায় তাঁহার এক পরিচিত হোটেলে উঠিয়াছিলেন। এই হোটেলে কলিকাতা আসিলেই তিনি উঠেন। বহুবার যাতায়াতের ফলে হোটেলের মালিকের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়াছে; খুব খাতির করে তাঁহাকে। ঠাকুর-চাকরেরাও বিশেষ সেবা-যত্ন করে। অবশ্য প্রত্যেকবার তিনি তাহাদের সন্তুষ্ট করেন। এবারে কোনও ঘর খালি ছিল না। অন্য লোক হইলে ফিরিয়া আসিতে হইত। কিন্তু মালিক একটা ঘর খালি করিয়া দিয়া তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সেই ঘরটিই কয়েক দিনের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহার অসুস্থ মেয়েকে লইয়া এখানে দিন কয়েক থাকিয়া শহরের কোন ভাল চিকিৎসক দ্বারা তাহার চিকিৎসা করাইবেন, এ কথা মালিককে জানাইয়াছেন। ভাড়াও দ্বিগুণ দিতে

স্বীকার করিয়াছেন। মালিক কোনও আপত্তি তোলে নাই। মেয়ের জন্য ফল কিনিয়াছেন, এক শিশি হর্লিক্স সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে আনিবার জন্য রেল-কোম্পানির কর্মচারীদের ঘুষ দিয়া এই যুদ্ধের ভিড়েও একটি ছোট কামরা রিজার্ভ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের ঘুম আসিতেছে না। নানা চিন্তা। মালবিকা ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়িতেছে। মালবিকা ও আত্রেয়ী কাঁদিয়াছিল। মালবিকা কাঁদিয়াছিল দুঃখে নয়, অপমানে। মর্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে তাহার—রূঢ় মর্মান্তিক আঘাত। যে অভিনেত্রী মহিমান্বিতা মহেন্দ্রাণীর অভিনয় করিতেছিল, দর্শকদের চক্ষের সামনে তাহার রূপসজ্জা কাড়িয়া লইয়া লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা, দাস-দাসীদের কাছে সে মাথা তুলিতে পারিবে না। আত্রেয়ী কাঁদিয়াছিল অভিমানে। সে তাঁহার বড় আদরের মেয়ে। ছোটবেলা হইতে এত স্নেহ পাইয়াছে তাঁহার কাছ হইতে যে, একটু ইতর-বিশেষ হইলে অভিমানে থমথম করিতে থাকে। কাজেই তাহার সম্বন্ধে তাঁহাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। আজ তাহার জীবনের এতবড় একটা ব্যাপারে, যাহাতে যোগ দিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে আত্মীয়স্বজন আসিয়া জড় হইতেছে, তাহার বাবা দূরে সরিয়া যাইবেন, ইহা তাহার পক্ষে মর্মান্তিক আঘাত; গভীর লজ্জার কারণও বটে। পিতার প্রিয়তমা কন্যা বলিয়া সংসারে সকলের কাছে যে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাহা পদচ্যুত রাজকর্মচারীর মত এক মুহূর্তে উবিয়া যাইবে। স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাহার ন্যায্য মূল্য হয়তো অনেক কমিয়া যাইবে; যতটুকু স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত, হয়তো পাইবে না।

অসিবার সময় অজিত উপস্থিত থাকিল না। খুব সম্ভব ইচ্ছা করিয়াই। তাহার অভিমান নয়, রাগ। সাংসারিক সমস্যা তিনি জটিল করিয়া তুলিতেছেন বলিয়া। জটিলতা শুধু সামাজিক নয়, আর্থিকও। সুমিত্রাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করা না গেলেও তাহার টাকাটা—বিশেষ করিয়া সে টাকার অঙ্ক যখন সামান্য নয়, আপনার না বলা যায় কি করিয়া? তাঁহারই বুদ্ধির দোষে সেই টাকাটা হাতছাড়া হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তাঁহার পেন্‌শন সম্বন্ধেও গোলযোগ। সেটা তো সম্প্রতি নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল; তারপর, যদি তাঁহাকে মৃত্যুরোগে ধরে ও তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে একেবারে ভাসিয়া গেল। ইহাতে কোন্ পুত্রের না রাগ হয়? পুত্রবধূরও রাগ হইয়াছে নিশ্চয়। আসিল যখন মুখ থমথমে, প্রণাম করিল নেহাত দায়-সারা গোছের; সকলকে দেখাইবার জন্যও এক ফোঁটা চোখের জল বাহির করিতে পারিল না।

কিন্তু সংসারকে এত আঘাত না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। সুমিত্রা তাঁহার প্রথম সন্তান। তাহারই মুখ দেখিয়া হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্যের সুধাক্ষরণ শুরু হইয়াছিল। অথচ সে-ই আজীবন বঞ্চিত রহিয়া গেল। আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া,

শেষবিদায়ের পূর্বে, নিজের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে নয়, ভিখারিণীর মত একটু স্নেহের জন্য সে যদি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তিনি তাঁহাকে ফিরাইবেন কি করিয়া?

গাড়ি মাঝে মাঝে থামিতেছে। যাত্রীদের ওঠানামার কোলাহল, খালাসীদের ষ্টেশনের নাম-হাঁকা, ষ্টেশনের অফিস-ঘরের মধ্যে টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের শব্দ, টেলিফোনে ষ্টেশন-বাবুর কথাবার্তা, এবং সকল শব্দের পটভূমিকা হিসাবে এঞ্জিনের শোঁ-শোঁ শব্দ। মাঝে মাঝে দুই-একটি ছোট-বড় পুলের উপর গুমগুম শব্দে গাড়ি পার হইতেছে। কখনও কখনও মাঝপথে গাড়ি থামিয়া যাইতেছে। এঞ্জিনটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে তারস্বরে পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ষ্টেশনে ঢুকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কামরার লোকগুলি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে; পাশের লোকটার নাক ডাকার বিরাম নাই।

রায় বাহাদুর উঠিয়া বসিলেন। জানালার বাহিরে তাকাইয়া দেখিলেন, দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। যেন সীমাহীন, বর্ণহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়া এক গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে চলিয়াছেন। বালিশের নীচে টাইম-টেব্‌ল ছিল; রায় বাহাদুর তাহা বাহির করিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, স্থান-কাল-সংস্থিতির মধ্যে তাঁহার গন্তব্য-স্থানের স্থিতি নির্ণয় করিতে লাগিলেন।

পরের দিন অপরাহ্নে পৌঁছিবেন সেখানে। সুমিত্রা যদি আসিয়া থাকে, পরের দিন সকালে ফিরিতে পারিবেন। রাত্রে স্নান আহার ও বিশ্রামের সুযোগ জুটিবে কি না কে জানে? যদি সুমিত্রা না আসিয়া থাকে তো সেই গ্রামে যাইতে হইবে। দূর—দুর্গম পথ, অপরিচিত। একবার মাত্র গিয়াছিলেন সেখানে। প্রায় বারো-তেরো ঘণ্টা নৌকায় যাইতে হইবে। এই বয়সে এই শরীরে এতখানি পথ যাওয়া-আসা সম্ভব হইবে কি? দেহে ও মনে গভীর ক্লান্তি অনুভব করিলেন রায় বাহাদুর। যে ভার বহন করিবার জন্য তিনি দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াছিলেন, তাহা দুর্বহ মনে হইল। সুমিত্রার উপরে মন বিরস হইয়া উঠিল। শেষ-বয়সে এই কঠিন সমস্যার সম্মুখে কেন ফেলিল তাঁহাকে? সারাজীবন সকল সমস্যা সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছেন তিনি। বরাবর স্রোতের সঙ্গে সাঁতার দিয়াছেন। আজ মন ও দেহের শক্তি—দুই নিঃশেষিত-প্রায়, এখন স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া সাধ্যে কুলাইবে কি? সুমিত্রার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভাল করেন নাই তিনি। অজিতের পরামর্শমত চিঠিতে ক্ষমা ও মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দিলেই হইত।

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল; মিনিট কয়েক পরেই আবার যাত্রা শুরু করিল। রায় বাহাদুর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের দিকে তাকাইতেই দেখিলেন, তাঁহার অন্যমনস্কতার অন্তরালে অন্ধকার কখন ফিকা হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে, বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের শেষের ক্ষীণ চাঁদ। আকাশে

এখানে-সেখানে চাংড়া চাংড়া মেঘ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা; একটা তারা জলজল করিতেছে। লাইনের ধারে কচুরিপানায় ভরা জলাভূমি; তাহার পারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ; মাঝে মাঝে গ্রাম, গ্রামান্তে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল ও সুপারি গাছের সারি, সব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। একটি অপূর্ব অনির্বচনীয় সুন্দর দৃশ্য। যেন এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গের ছায়া ক্ষণেকের জন্য পড়িয়াছে পৃথিবীতে।

রায় বাহাদুর মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্তের জন্য রায় বাহাদুর সমাজ সংসার ভুলিলেন, সমস্যা ভুলিলেন, দুঃখ বেদনা আঘাত ও প্রত্যাঘাত ভুলিলেন। আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী স্নিগ্ধ, সুগভীর শান্তির স্পর্শ তাঁহার মনে লাগিল; তাঁহার মনের দাহ জুড়াইয়া গেল। সুমিত্রার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে যে বিরক্তির মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্যের উপর সঞ্চারিত হইল নিদ্রার কুহেলিকা; চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর শুইয়া পড়িলেন এবং শুইবামাত্র ঘুমাইলেন।

বেলা নয়টার সময় ট্রেন হইতে নামিয়া আরও ঘণ্টা করেক ষ্টীমারে আসিয়া, রায় বাহাদুর গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিলেন। জায়গাটি নেহাত ছোট। অনেক লোক নামিল। সকলেই নিজের নিজের পোঁটলা-পেঁটরা কাঁধে-কাঁখে লইয়া চলিল। রায় বাহাদুরও নিজের বিছানাটি এক হাতে ও সুটকেসটি আর এক হাতে লইয়া ভিড়ের ধাক্কা খাইতে খাইতে জেটির বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিতেই একটি ছেলে তাঁহাকে নমস্কার করিল। ছেলেটির বয়স ষোল, কি সতেরো। পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে, কুণ্ঠিত হাব-ভাব। পাঁড়াগাঁয়ের ছেলেরা সাধারণত যেমন হয় তেমনই। ছেলেটি সবিনয়ে কহিল, আপনার নাম কি—

রায় বাহাদুর কহিলেন, হ্যাঁ। তুমি?

ছেলেটি কহিল, আমি আপনাকে নিতে এসেছি। কাল আপনার আসার কথা ছিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, হ্যাঁ, বাবা। বিশেষ কাজে দেরি হয়ে গেল। কবে এসেছ তোমরা?

ছেলেটি কহিল, কাল বিকেলে এসেছি।

রায় বাহাদুর কহিলেন, তোমরা আমার মেয়েকে 'মা' বল তো? কেমন আছে তোমার মা?

ছেলেটি সম্ভবত তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না। সে এদিক-সেদিক তাকাইয়া বোধ করি একটা কুলির খোঁজ করিতেছিল। খোঁজ না পাইয়া কহিল, না, কুলি পাওয়া যাবে না। আমাকেই দিন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সে কি বাবা। তা কি হয়?

ছেলেটি কহিল, ওই তো সামান্য জিনিস; এমন কিছু ভারী নয়; খুব নিয়ে যেতে পারব; বেশি দূর তো নয়।—বলিয়া রায় বাহাদুরের হাত হইতে এক রকম জোর করিয়া জিনিসগুলা লইতেই রায় বাহাদুর কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, তুমিই দুটো নেবে! আমাকে বরং একটা দাও।

ছেলেটি মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না না, তা কি হয়? কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন? বেশি দূর নয়, আসুন।

কাঁচা-রাস্তার দুই পাশে বাজার, চা-খাবারের দোকান, লটকন-মসলার দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়ের ও কাটা-কাপড়ের দোকান, দর্জীর দোকান, চালের আড়ত, কয়লার আড়ত, বিশুদ্ধ হিন্দু-হোটেল, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা। একেবারে শেষপ্রান্তে একটি ছোট ঘর, ছেঁচা-বেড়ার দেওয়াল, গোলপাতার ছাউনি। সেই ঘরটির সামনে ছেলেটি দাঁড়াইল। ঘরের দরজা বন্ধ। সামনে একফালি বারান্দা। সেখানে একটি টিনের চেয়ারে একটি ছেলে শুষ্কমুখে বসিয়া ছিল। ইহাদের দেখিয়া নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মালিক ও আরও জনকয়েক লোক আসিয়া হাজির হইল। মালিক রায় বাহাদুরকে কহিল, আপনি বুঝি, যে স্ত্রীলোকটি মারা গেছে, তার আত্মীয়?

রায় বাহাদুরকে যেন অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত করিল লোকটা। আপাদমস্তক ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। আর্তকণ্ঠে কহিলেন, মারা গেছে? কখন? তাঁহার সারাদেহ পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল; দেহের ও মনের শক্তি রেণু রেণু হইয়া গুঁড়া হইয়া গেল; সেইখানে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

মালিক হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোমর জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, করেন কি? করেন কি? মাটির ওপরেই বসছেন যে! ছেলেদের দিকে তাকাইয়া কহিল, চেয়ারটা দিলাম যে হে ছোকরা—কোথায় সেটা? এনে দাও না! একটি ছেলে তাড়াতাড়ি চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিতেই মালিক রায় বাহাদুরকে তাহার উপরে বসাইয়া দিল।

মালিক কহিল, আপনি কি ব্রাহ্মণ? রায় বাহাদুর সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন; মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ বাবা। মালিক দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আমিই এই ঘরের মালিক। হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই যে আদর্শ হিন্দু-হোটেল, মস্ত বড় সাইনবোর্ড টাঙানো আছে যার সামনে, ওটা আমারই। আর এক দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই যে কাঠ-কয়লার আড়ত, ওটাও আমারই। হাত নামাইয়া কহিতে লাগিল, বিদেশ-বিভুঁই থেকে যাত্রীরা এসে আমার ওখানেই থাকে, খায়। ছেলে দুটি আর ওই মেয়েটি কাল বিকেলে এল; মেয়েটিকে দেখলাম ধুঁকছে; দেখেই

বললাম, ও আর বেশিক্ষণ নয়। ঘর দিলাম, আসবাব-পত্র দিলাম; ডাক্তার ডেকে দিলাম। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আমাদের কেনারাম ডাক্তার, চিতের তোলা মড়াকেও ঘরে ফিরিয়ে আনে। মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নাঃ! চিকিচ্ছের কোনও ত্রুটি হয় নি, মশায়। মানুষের সাধ্যে যতটা হয় হয়েছে, কিন্তু কালই ওর যাবার দিন, কে আটকাবে বলুন? ভোর-রাতে মেয়েটি মারা গেল। খবর পেয়েই ছুটে এলাম; কাঠ-কয়লা, লোকজনের ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। ছেলে দুটি বললে, আপনি আসবেন; আপনি না এলে কিছু হবে না। তা এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে। একবার চোখের দেখা দেখে নিন। আমার এদিকে সব প্রস্তুত। কোনও চিন্তা নেই। কেবল একটি কাজ করবেন, যাবার আগে পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে যাবেন। একটি ছেলে কহিল, মা কাল আপনার জন্যে ভারি ছটফট করেছিলেন।

রায় বাহাদুর প্রস্তর-মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন; চক্ষে বিহ্বল দৃষ্টি। তাঁহার চৈতন্যলোকে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কন্যার করুণ প্রার্থনা বিস্মৃত-প্রায় কোমল কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর পরদিন সকালেই ফিরিলেন। সুমিত্রার শেষকৃত্যে কোন ত্রুটি হয় নাই। হোটেলের মালিক নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাঁহারও সেবা-যত্ন করিয়াছে খুব। তিনি টাকাকড়ি সমস্ত মিটাইয়া দিয়া, মালিকের ছেলেমেয়ের হাতে মিষ্টি খাইবার জন্য দশ টাকা দিয়া আসিয়াছেন। মালিক একেবারে গদগদ হইয়া উঠিয়াছিল; আসিবার সময়ে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় ও জিভে ঠেকাইয়া কহিয়াছিল, এদিকে আর যদি কখনও আসা হয়, অধমের এখানেই পদধূলি দেবেন। ছেলে দুটি ষ্টীমার-ঘাট পর্যন্ত সঙ্গে আসিল। বিদায়ের পূর্বে তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহাদের বুকে জড়াইয়া আশীর্বাদ করিলেন। ষ্টীমার ছাড়িতে দেরি ছিল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া এপারের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নদীর তীরে ওই কেয়াঝোপের কাছে, তাঁহার চোখের সামনে সুমিত্রা ছাই হইয়া গেছে। রুগ্ন দুর্বল দেহে এত কষ্টে এতদূর পথ আসিয়াও তাহার আশা মিটে নাই। মৃত্যুর আগে ক্লান্ত বিহ্বল নয়ন মেলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে খুঁজিয়াছে। গভীর নিরাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে। দীর্ঘ যাত্রাপথে কোন সম্বল না লইয়াই যাত্রা করিতে হইয়াছে তাহাকে।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ক্রমে ষ্টীমার-ঘাট, বাজার, নদীতীরবর্তী কেয়াঝোপ, কেয়াঝোপের কোলে শ্মশানভূমি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর সরিয়া আসিয়া নিজের জায়গাটিতে বসিলেন। দেহ শ্রান্ত; মন শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু কোথায় কোন্ রন্ধ্রপথ দিয়া মনের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিতে লাগিল। যেন কোন কঠিন পরীক্ষায় বসিবার পূর্বমুহূর্তে পরীক্ষা দেওয়া হইতে রেহাই পাইয়া গিয়াছেন। ঘণ্টা দুই পরে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল, এবং স্নানাহার করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

যখন বাড়ি ফিরিলেন, বেলা নয়টা। বাহিরের বারান্দায় নাতি-নাতনীরা খেলা করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাড়ির মধ্যে খবর দিতে ছুটিল।

রায় বাহাদুর বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হইলেন। ঠিক এইখানে, এইভাবে বসিবার জন্য ভিতরে ভিতরে তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বসিয়া গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। এবং চাকর কাছে আসিতেই তামাক আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

খবর পাইয়াই গৃহিণী, পুত্রবধূ, কন্যা, দাস-দাসী সকলে ছুটিয়া আসিল। সকলের মুখেই আনন্দের হাসি। গৃহিণী কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যবস্থা ক'রে এলে?

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সুমিত্রার স্মৃতি ইহার মধ্যেই মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। জোর করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমাকে কিছুই করতে হয় নি; ভগবান নিজে ব্যবস্থা করেছেন। যে সমস্যার কূল-কিনারা পাই নি আমরা, তিনি নিজে তার সমাধান ক'রে দিয়েছেন।

শ্রীঅমলা দেবী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ মৃত্যু : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

রচনাপঞ্জী

গিরিশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে; ইহার বেশীর ভাগই নাট্যগ্রন্থ। তাঁহার ছোট-বড় একাধিক জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চরিতকারদের কেহই তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির প্রকাশকাল-সমেত একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থগুলির প্রথমাভিনয়ের তারিখ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রথমাভিনয়ের তারিখ হইতে নাটকের রচনা ও প্রকাশকালের আভাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল সময়ে এ নিয়ম খাটে না, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁহার কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ অভিনয়ের অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। আসলে এরূপ গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন মোটেই সহজসাধ্য নহে। গিরিশচন্দ্রের অনেক পুস্তক বর্তমানে একান্ত দুষ্প্রাপ্য, কতকগুলির টাইটেল-পেজ বা আখ্যাপত্রে আদৌ প্রকাশকাল নাই, কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই,—'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'তেই প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। কার্যের দুরূহতা

সত্ত্বেও আমরা বিশেষ পরিশ্রমে একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক গ্রন্থ-তালিকা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তালিকায় সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল-নির্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই রচনাপঞ্জী সঙ্কলনে শ্রীমান্ সনৎকুমার গুপ্ত আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

		বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত প্রকাশকাল	পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ; বন্ধনীমধ্যে প্রথমাভিনয়ের তারিখ
১।	আগমনী (নাট্যরাসক)*	১৮৭৭, ২৯ সেপ্টেম্বর	
২।	অকাল বোধন (নাট্যরাসক)*	১৮৭৭, ৩ অক্টোবর	
৩।	দোল-লীলা (বিশুদ্ধ তানলয়-সংযুক্ত গীতপূর্ণ নাট্যগীতি)†	১৮৭৮, মার্চ	ইং ১৮৭৮ (ন্যাশনাল ৬ চৈত্র ১২৮৪, দোল-পূর্ণিমা)
৪।	যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন A Kiss in the Dark (রঙ্গনাট্য)‡	১৮৭৮, ৬ জুলাই	১২৮৫
৫।	মায়া-তরু (A Musical Melang)	১৮৮১, ১১ ফেব্রুয়ারি	?
৬।	মোহিনী প্রতিমা (গীতি-নাট্য)	১৮৮১, ১৬ এপ্রিল	১২৮৭, ১৯ চৈত্র
৭।	আনন্দ রহো (ঐতিহাসিক নাটক)	১৮৮১, ১৭ আগষ্ট	১২৮৮
৮।	রাবণবধ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮১, ৫ নবেম্বর	১২৮৮ (ন্যাশনাল ৩০-৭-৮১)
৯।	অভিমন্যু-বধ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮১, ২৬ নবেম্বর	১২৮৮
১০।	সীতার বনবাস (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ২০ জানুয়ারি	১২৮৮, মাঘ

* পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে "মুকুটাচরণ মিত্র" নাম আছে। লেখক ইহাকে তাঁহার "প্রথম রচনা-কুসুম" বলিয়াছেন।

† পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। "শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।"

‡ পুস্তিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। "শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।" নবাবিষ্কৃত এই রঙ্গনাট্যখানি আমি ১৩৫২ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

১১।	লক্ষ্মণ-বর্জ্জন (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ৫ ফেব্রুয়ারি	১২৮৮, মাঘ
১২।	সীতাহরণ (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮২, ২১ আগষ্ট	১২৮৯
১৩।	রামের বনবাস (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ২৬ আগষ্ট	১২৮৯
১৪।	মলিন মালা (গীতিনাট্য)	১৮৮২, ১৬ সেপ্টেম্বর	১২৮৯
১৫।	ভোট মঙ্গল। সজীব পুতুলো নাচ (ব্যঙ্গনাট্য)*	১৮৮২	১২৮৯ (ন্যাশনাল ৭-১০-৮২)
১৬।	ব্রজবিহার (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৮৮৩, ১ এপ্রিল	(ন্যাশনাল চৈত্র ১২৮৮)
১৭।	হীরার ফুল (গীতিনাট্য)	১৮৮৪, ২৩ এপ্রিল	১২৯১
১৮।	বৃষকেতু (নাটক)	১৮৮৪	(ষ্টার ২৬-৪-৮৪)
১৯।	চৈতন্যলীলা (নাটক)	১৮৮৬, ১০ আগষ্ট	? (ষ্টার ২-৮-৮৪)
২০।	বেল্লিক বাজার (প্রহসন)	১৮৮৭	(ষ্টার ২৪-১২-৮৬)
২১।	বুদ্ধদেব-চরিত (নাটক)	১৮৮৭, ২২ এপ্রিল	১৮৮৭, ২২ এপ্রিল (ষ্টার ১৯-৯-৮৫)
২২।	(সচিত্র) নল-দময়ন্তী (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮৭, ৩০ জুলাই	১৮৮৭, ৩০ জুলাই (ষ্টার ২১-১২-৮৩)
২৩।	চন্দ্রা (উপন্যাস)	১৮৮৭, ৭ সেপ্টেম্বর	১২৯৪
২৪।	রূপ-সনাতন (নাটক)	১৮৮৮, ২৮ জানুয়ারি	? (ষ্টার ২১-৫-৮৭)
২৫।	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (নাটক)	১৮৮৮, ২৫ অক্টোবর	? (ষ্টার ৩-৭-৮৬)
২৬।	পূর্ণচন্দ্র (নাটক)	১৮৮৮, ১ ডিসেম্বর	? (এমারেল্ড ১৭-৩-৮৮)

* পুস্তিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা "ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনয় জন্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।"

২৭।	মেঘনাদ বধ (নাটকাকারে গঠিত)	১৮৮৯, ২ জানুয়ারি *	
২৮।	প্রফুল্ল (সামাজিক নাটক)	১৮৮৯, ২২ আগষ্ট	
২৯।	(সচিত্র) দক্ষযজ্ঞ (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮৯	১২৯৬ (ষ্টার ২১-৭-৮৩)
৩০।	বিবাহ (নাটক)	১৮৮৯, ২০ সেপ্টেম্বর	১২৯৫ (এমারেল্ড ৬-১০-৮৮)
৩১।	হারানিধি (নাটক)	১৮৯০, ১৪ জুন	১২৯৭, ২ জ্যৈষ্ঠ
৩২।	মলিনা-বিকাশ (নাট্য-গীতি)	১৮৯১, ২২ ফেব্রুয়ারি	১২৯৭
৩৩।	মহাপূজা (রূপক)	১৮৯১, ২২ ফেব্রুয়ারি	১২৯৭, পৌষ
৩৪।	কমলে কামিনী (নাটক)	১৮৯১, ১৫ অক্টোবর	? (ষ্টার ২৯-৩-৮৪)
৩৫।	মুকুল-মুঞ্জরা (নাটক)	১৮৯৩, ফেব্রুয়ারি †	?
৩৬।	আবু হোসেন (গীতিনাট্য)	১৮৯৩, ১ জুলাই	১৩০০
৩৭।	বড়দিনের বখ্‌শিশ্‌ (পঞ্চরং)	১৮৯৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি	ইং ১৮৯৪
৩৮।	জনা (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৪, ২৮ ফেব্রুয়ারি	১৮৯৪, ফেব্রুয়ারি
৩৯।	আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপ (পঞ্চরং)	১৮৯৪, ১ মে	১৩০১ (ন্যাশনাল ৯-৪-৮১)
৪০।	স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	১৮৯৪, ১ ডিসেম্বর	?
৪১।	সভ্যতার পাণ্ডা (বড়দিনের পঞ্চরং)	১৮৯৪, ২৪ ডিসেম্বর	১৩০১
৪২।	কমলেতি বাই (দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৫, ২০ মে	১৩০২, ২৯ বৈশাখ
৪৩।	ফণির মণি (গীতিনাট্য)	১৮৯৬, জানুয়ারি	?
৪৪।	পাঁচ ক'নে (পঞ্চরং)	১৮৯৬, ৫ জানুয়ারি	১৮৯৬, ৫ জানুয়ারি

* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বসুমতী') ইহা প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সনের ৩০ ডিসেম্বর ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়; উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র "আনন্দের সহিত এই নাটকখানি পুনরায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং আরও নূতন সঙ্গীত রচনাপূর্বক ইহাকে নববেশ পরাইয়া দিয়াছেন।"

† ১২৯৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে সমালোচিত।

৪৫।	নসীরাম (নাটক)	১৮৯৬, ১৫ জুন	১৩০৩ (ষ্টার ২৩-৫-৮৮)
৪৬।	কালাপাহাড় (ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৬, ৩ অক্টোবর	১৮৯৬, ৩ অক্টোবর
৪৭।	হীরক জুবিলী (গীতিনাট্য)	১৮৯৭, ১৫ অক্টোবর	?
৪৮।	পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা (গীতিনাট্য)	১৮৯৭	১৩০৪ (ষ্টার ১১-৯-৯৭)
৪৯।	মায়াবসান (নাটক)	১৮৯৮, ৭ ফেব্রুয়ারি	১৩০৪, ১১ পৌষ
৫০।	দেলদার (গীতিনাট্য)	১৮৯৯, ৬ জুন	১৩০৬
৫১।	ম্যাক্‌বেথ (বঙ্গানুবাদ)	১৯০০, ২ আগষ্ট	১৩০৬ (মিনার্ভা ২৮-১-৯৩)
৫২।	পাণ্ডব-গৌরব (পৌরাণিক নাটক)	১৯০০, ২৫ অক্টোবর	১৩০৬
৫৩।	মণিহরণ (গীতিনাট্য)	১৯০০, ১৫ অক্টোবর	?
৫৪।	নন্দদুলাল (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৯০০, ১৫ অক্টোবর	১৩০৭
৫৫।	অশ্রু-ধারা (রূপক)	১৯০১, ৭ মে	ইং ১৯০১
৫৬।	মনের মতন (নাটক)	১৯০১, ১ জুন	১৩০৮, বৈশাখ
৫৭।	অভিশাপ (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৯০১, ২৮ অক্টোবর	১৩০৮, ১২ আশ্বিন
৫৮।	শান্তি (বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)	১৯০২, ১৪ জুলাই	
৫৯।	ভ্রান্তি (নাটক)	১৯০২, ২৭ আগষ্ট	১৩০৯
৬০।	আয়না (সামাজিক নক্সা)	১৯০৩, ১০ মার্চ	?
৬১।	গিরিশ-গীতাবলী : ১ম ভাগ * ২য় ভাগ	১৯০৪, ২ মার্চ (ইং ১৯১৩)	
৬২।	সৎনাম (ঐতিহাসিক নাটক)†	১৯০৪, ৫ মে	১৩১১, ১৮ বৈশাখ
৬৩।	সীতারামের গীতাবলী	১৯০৪	১৩১১, ২১ আশ্বিন
৬৪।	হর-গৌরী (গীতিনাট্য)	১৯০৫, ৮ মার্চ	১৩১১, চৈত্র
৬৫।	বলিদান (সামাজিক নাটক)	১৯০৫, ৩ জুন	১৩১২
৬৬।	সিরাজদ্দৌলা (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৬, ১০ জানুয়ারি	১৩১২, আশ্বিন

* ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের পুস্তকে অনেক অতিরিক্ত গান—যেমন, দুর্গেশ-নন্দিনীর নাট্য-রূপের—স্থান পাইয়াছে।

† সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ-প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'র ১০ম ভাগে 'বৈষ্ণবী' নামে মুদ্রিত।

৬৭।	বাসর (গীতপ্রধান নাটক)	১৯০৬	ইং ১৯০৬
৬৮।	মীরকাসিম (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৬, ৭ নবেম্বর	
৬৯।	ব্যায়সা-কা-ত্যায়সা (প্রহসন)	১৯০৭, ১৬ জুলাই	১৩১৩, ২৭ পৌষ
৭০।	ছত্রপতি (শিবাজী)— (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৭, ৫ সেপ্টেম্বর	১৩১৪, ১৫ ভাদ্র
৭১।	বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (জীবনী)	১৯০৮, ২৬ সেপ্টেম্বর	১৩১৫, ১০ আশ্বিন
৭২।	শাস্তি কি শাস্তি ? (সামাজিক নাটক)	১৯০৮, ১৫ ডিসেম্বর	১৩১৫, ৩ পৌষ
৭৩।	শঙ্করাচার্য্য (ধর্ম্মমূলক নাটক)	১৯১০, ২৫ আগষ্ট	১৩১৬, চৈত্র
৭৪।	অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯১১	১৩১৭, চৈত্র
৭৫।	প্রতিধ্বনি (কবিতা)	১৯১১, ৩ নবেম্বর	১৩১৮, ৪ আশ্বিন
৭৬।	তপোবল (পৌরাণিক নাটক)	১৯১১, ২৩ ডিসেম্বর	১৩১৮, ৩ পৌষ

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৭৭।	আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মী (সামাজিক নাটক)*	১৯১২, ২১ সেপ্টেম্বর	১৩১৯
৭৮।	ছটাকীণ	১৯২৭, ২৭ ডিসেম্বর	১৩৩৪, ৮ পৌষ
৭৯।	দুর্গেশনন্দিনী (নাট্য-রূপ)‡	১৯৩৩, ৩ মার্চ	? (মিনার্ভা ১১-২-১৯০৬)
৮০।	সীতারাম (নাট্য-রূপ)‡	১৯৩৯, ২৭ অক্টোবর	? (মিনার্ভা ২৩-৬-১৯০০)

গিরীশ-গ্রন্থাবলী : ইং ১৮৯২-১৯০০।

গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সর্বপ্রথম ৬ খণ্ডে 'গিরীশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে

* অসমাপ্ত রচনা। পঞ্চম অঙ্কটি দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক লিখিত।

† অসমাপ্ত রচনা। এই অসমাপ্ত অংশটুকু ১৩৩৩ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে "বুদ্ধিমন্ত" নামে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ২৯-৪৮ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক লিখিত।

‡ বসুমতী-প্রকাশিত "নাট্য-সিরিজে" ভুলক্রমে "অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত" বলিয়া প্রচারিত। এই প্রসঙ্গে ১৩৫২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত না হইয়া এই গ্রন্থাবলীতেই প্রথমে মুদ্রিত হয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখসহ সেগুলির নাম দিতেছি।—

১ম ভাগ (১ মে ১৮৯২) :—'ধ্রুব-চরিত্র' (২৭ শ্রাবণ ১২৯০), 'প্রভাসযজ্ঞ' (২১ বৈশাখ ১২৯২), 'প্রহ্লাদচরিত্র' (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১), 'নিমাইসন্ন্যাস' (১৬ মাঘ ১২৯১)।

২য় ভাগ (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) :—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১ মাঘ ১২৮৯)—পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'চণ্ড' (১১ শ্রাবণ ১২৯৭), 'শ্রীবৎসচিন্তা' (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১)।

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৯৪ ?) :—'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' (২২ আশ্বিন ১৩০০)।*

৫ম ভাগ (১৫ এপ্রিল ১৮৯৫) :—'সীতার বিবাহ' (২২ ফাল্গুন ১২৮৮)।

* * *

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০ খণ্ডে 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। ইহাতে নবাবিষ্কৃত 'যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন', 'মেঘনাদ বধ' (নাট্য-রূপ), 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি', 'ছটাকী', এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'সীতারামে'র নাট্য-রূপ ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পুস্তক-প্রবন্ধাদি সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীতে গিরিশচন্দ্রের যে কয়খানি নাট্যগ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেগুলি :—

১ম ভাগ :—'চোল-রাজ' (অসমাপ্ত)

৩য় ভাগ :—অপ্রকাশিত নাটক (অসম্পূর্ণ)

৮ম ভাগ :—'নিত্যানন্দ-বিলাস'

১০ম ভাগ :—'রাণা প্রতাপ' (অসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক) ; 'সাধের বউ' (অসমাপ্ত সামাজিক নাটক)।

মাসিকপত্র-সম্পাদন

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৫) গিরিশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সৌরভ' মাত্র তিন মাস জীবিত ছিল।

* গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইবার পূর্বে "পূজা পঞ্চরং সপ্তমীতে বিসর্জন" দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজ্‌লিস্' পত্রে (৩য় বর্ষ, আশ্বিন ১৩০০, পৃ. ৫০-৭৩) প্রথমে প্রকাশিত হয়। চৈতন্য লাইব্রেরিতে এই রচনার প্রতিলিপি পুস্তিকাকারে বাঁধান আছে।

দ্রষ্টব্য :—এই রচনাপঞ্জীতে উল্লিখিত পৌরাণিক নাটক 'বৃষকেতু'র মূল সংস্করণ আমি দেখি নাই ; 'বেল্লিক বাজার' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পুস্তক দুইখানি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু মলাট বা আখ্যাপত্র না-থাকায় সেগুলিরও সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকবর্গের কেহ এ-বিষয়ে আলোকপাত করিলে পরম আনন্দের বিষয় হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

বহুকালের মজা পুকুর, বর্ষার সময় একেবারে মাঝখানে খানিকটা জল জ'মে থাকত। জলজ ঘাসে কলমি-শুষনেলতায় ভ'রে থাকত, স্থানীয় মুসলমানদের হাজী সাহেবের, তামাকওয়ালা সাহজীর, স্বর্ণবাবুর চাপরাসী বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহের তিনটে দেশী ঘোড়া এসে স্বেচ্ছামত আহার এবং বিচরণ ক'রে বেড়াত। এখানকার অশ্ববাতিকগ্রস্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা দল বেঁধে এসে অশ্বমেধের ঘোড়া ধরার মত ঘোড়াগুলিকে ধরত এবং নির্জন প্রান্তরে ঘোড়দৌড়ের শখ মেটাত। বৃদ্ধ গোবিন্দ সিং বহুকাল বাঙালী বাবুদের ঘরে চাকরি ক'রে ভাল বাংলা তো শিখেইছিল, ইংরেজী বুলিও কিছু কিছু বলতে পারত। বৃদ্ধ বলত, "মাই হর্স ইজ ইন দি লড়িয়া পণ্ড।" মজা-পুকুরটার নাম 'লড়িয়া'। এখানকার প্রবাদ, এখন যেখানে মুসলমানপাড়া, সেইখানে ছিল হিন্দুরাজার রাজধানী। একদা এখানে এলেন এক পাঠান ফকির, সঙ্গে একদল তুর্কী। তাঁরা ঘাটবন্দরের পাশে তুরুকডাঙার তাঁবু গাড়লেন। তারপর রাজার সঙ্গে হ'ল যুদ্ধ। যুদ্ধটা হ'ল এই লড়িয়া পুকুরের ধারে। হিন্দুরাজা সবংশে ধ্বংস হলেন। অবশ্যই তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী আছে, গোশৃঙ্গে মশাল বেঁধে রাত্রিকালে তুর্কীদের অগ্রসর হওয়ার কথা আছে ; কিন্তু সে কথা থাক্। মোট কথা, এই পুকুরের পাশেই লড়াই হয়েছিল, তাই পুকুরটার নাম লড়িয়া। কালক্রমে লড়িয়া ম'জে এসেছিল, পুকুরটার মাঝখান দিয়ে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সড়ক চ'লে গিয়েছিল ; গোপীচন্দ্র লড়িয়াকে কিনে, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে সড়কটাকে ঘুরিয়ে তৈরি ক'রে দিয়ে, কাটিয়ে সরোবর ক'রে তুলেছেন। কাটানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ হঠাৎ কয়েক টুকরা ভাঙা মূর্তির সঙ্গে এক অভগ্ন বাসুদেবমূর্তি বেরিয়ে পড়েছে। শুধু মূর্তিটির এক পাশে কোদালের একটা আঘাত প'ড়ে খানিকটা অঙ্গহীন হয়েছে।

সংবাদটা পেয়ে গোপীচন্দ্র চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। প্রচলিত সংস্কারে দেবদেবী নিয়ে অনেক বিচিত্র ধারণা আছে। দেবতা চরম সৌভাগ্য নিয়ে আসেন,

আবার দুর্ভাগ্য নিয়েও আসেন। সরকারবাবুরা ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শুধু কেনা-বেচার দালালি করতেন, স্থানীয় গন্ধবণিকদের আশ্রিত ছিলেন। এক সাধু এসে সেবায় তুষ্ট হয়ে দিয়ে গেলেন রাজরাজেশ্বর-শিলা। সরকারেরা ধনে ধান্যে রাজ্যেশ্বর হয়ে উঠলেন রাজরাজেশ্বরের প্রসাদে।

আবার দশ ক্রোশ দূরবর্তী বিখ্যাত রায়বংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল এক সূর্যনারায়ণ শিলামূর্তি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা ক'রে। পালকি চেপে যাবার পথে এক গাছতলায় প'ড়ে থাকতে দেখেন এই মূর্তিটিকে। ঠিক এই ভাবেই একটা মাঠের পুকুর থেকে পাঁক তুলতে গিয়ে চাষীরা মূর্তিটিকে পেয়েছিল। তারা কেউ ভরসা ক'রে বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস করে নাই, ফেলে রেখেছিল গাছতলায়। রায় মূর্তিটিকে পালকিতে তুলে বাড়ি এনে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এক পুরুষের মধ্যেই রায়বংশ একরকম ধ্বংস হয়ে গেল। জমিদারি গেল, প্রকাণ্ড পরিবারটায় কতক কলেরার আক্রমণে শেষ হ'ল, কতক গৃহত্যাগ ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু দৃষ্টান্ত আছে। গোপীচন্দ্রের স্ত্রীও ভাবিত হলেন। কর্মচারীরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে রইল। গোপীচন্দ্র হঠাৎ সব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। কেন তাঁর দুর্ভাগ্য আসবে? অপরাধ তো তিনি কিছু করেন নাই। তিনি দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করছেন, দেশের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করছেন ; দেশের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা দিতে আরম্ভ করেছে, রাজা—যিনি কিনা সর্বদেবতার অংশ তাঁর প্রতিভূ তাঁকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখেছেন, এই অবস্থায় দেবতা এলেন। সে দেবতা কেন আনবেন দুর্ভাগ্য? তিনি আনলেন তাঁর পরিপূর্ণ সৌভাগ্য। ত্রিলোকপতি বিষ্ণু! প্রণাম! হে ত্রিলোকপতি দেবতা, তোমাকে প্রণাম!

গোপীচন্দ্র নিজে এলেন ; একেবারে যেখানে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন। কর্মচারীদের বললেন, চাপরাসীদের ডাক। আশপাশ গ্রামে যত ঢাক ঢোল সানাই বাঁশি পাওয়া যায় নিয়ে আসুক। বাড়ির পূজারীদের ডাক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা স্নান ক'রে জল নিয়ে এস। বাড়ি থেকে নতুন পিতলের কলসী নাও। আর রূপোর ঘড়ায় গঙ্গাজল আন এক ঘড়া। রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রায় যে কাঠের দোলনা আছে, নিয়ে এস। তার দু পাশে, পালকির ডাঁটের মত বাঁশ বেঁধে ফেল, ভিতরে গালিচা পেতে দাও। শিগগির কর।

ইতিমধ্যে এসে পড়ল কল-কাটা বায়েন আর জীবন বায়েন ঢাক কাঁধে নিয়ে। এই গ্রামেরই বাদ্যকর দুজন। গোপীচন্দ্র বললেন, বাজা বাজা।

ঢাক বাজতে লাগল। লোক জমতে লাগল। ইস্কুলঘরে যারা কাজ করছিল, ইটখোলায় যারা মজুর খাটছিল, তারা এসে জমল। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তায় মজুরেরা

ঝুড়ি কোদাল ফেলে দিয়ে ছুটে এল। পথিক যারা যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়াল। গন্ধবণিকপল্লী মোদকপল্লী সাহাপল্লীর সকলে ছুটে এল। অদূরবর্তী গ্রামটার প্রান্তভাগে ঢাক বেজে উঠল, শব্দ এগিয়ে আসছে; ক্রমশ দেখা গেল ঢাকীদের সঙ্গে কালো কালো মানুষের সারি।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ জ'মে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভরা দুপহর বেলা, আকাশের দিকে চাওয়া যায় না, চারিদিকে মাঠে ধূলা উড়ছে, পায়ের তলায় মাটিতে অসহনীয় উত্তাপ, কিন্তু এসব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে মানুষের কাছে। নারী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা অদ্ভুত বিস্ময়ে ছুটে এসেছে। দু-একটা পুকুর থেকে ভাঙা মূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু গোপীচন্দ্রের দিঘি থেকে এমন অক্ষত মূর্তিতে দেবতা ওঠা সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এরই মধ্যে রটনা হয়ে গিয়েছে, গোপীচন্দ্র রাজা হবেন, দেবতা তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, তাই তিনি এ মজা দিঘিটা কাটিয়েছেন, ইত্যাদি। গোপীচন্দ্রের নবার্জিত সম্পদের পটভূমিতে, ইস্কুল-স্থাপনের উদ্যোগে রাজপুরুষের অনুগ্রহ দেখানোর ভূমিকায় পর এই দেবতার আবির্ভাব, তার সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশখানা ঢাক বিশ-পঁচিশখানা ঢোলের বাজনার সমারোহ সমস্ত ব্যাপারটাকে অলৌকিক না হ'লেও লোকের কল্পনাতীত বিস্ময়কর ঘটনা ক'রে তুলেছে।

মুসলমানেরাও এসেছে, তারা এক পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে তাদের স্পর্শদোষ আপত্তিজনক হবে, এটা তারা জানে। এ নিয়ে তাদের মনে কোন গ্লানি অবশ্য নাই, কারণ এইটাই তাদের অনেক কালের অভ্যাস। তারাও আলোচনা করছে, গোপীচন্দ্র এবার নিশ্চিত রাজা হবেন।

হাজী এবারতও এসেছে, সে বলছে, যিনি আল্লাতাল্লা তিনিই ভগবান, যিনি রাম, তিনিই রহিমের ভাই। দেবতা উঠল, সে খোদাতালার দয়া। উনিকে আর ঠেকায় কে?

রাধাকান্ত এবং বংশলোচন এসে পুকুরের গর্ভে নামলেন। স্বর্ণভূষণ আসেন নাই। পথের মধ্যেই হঠাৎ কেমন অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হয়ে পড়ল তাঁর। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী কালাচাঁদ চন্দের দোকানে তিনি ব'সে পড়েন। মুখে চোখে জল দিয়ে হাওয়া ক'রে একটু সুস্থ ক'রে কালাচাঁদই তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, আসুন, আসুন।

• • •

বাড়িতে ফিরে রাধাকান্ত নিজের ডায়েরি লিখলেন। তার মধ্যে গোপীচন্দ্রের সৌভাগ্য আজ পরিপূর্ণ হ'ল—এই কথাটাই বড় হয়ে উঠল। পূর্বজন্মের কর্মফল এ জন্মের ভাগ্যকে সৃষ্টি করে—এই সত্যটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠল সমস্ত কথার অন্তরালে।

মামা রয়েছেন?

কে?—চমকে উঠলেন রাধাকান্ত।—গোপীচন্দ্রবাবু? ব্যস্ত হয়ে তিনি উঠে বাইরে এলেন। গোপীচন্দ্রই।

আসুন, আসুন। এমন সময়ে? ঠাকুর এলেন?

গোপীচন্দ্র ঈষৎ চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। আজকের ঘটনা তাঁর ধীরতাকে নাড়া দিয়েছে। তিনি বললেন, ঠাকুর আসছেন। কিন্তু ঠাকুর নিয়ে কি করব বলুন তো? আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে এলাম। আপনাকেই আমি শ্রদ্ধা করি।

রাধাকান্ত বললেন, তাই তো, এর উত্তর আমি কি দেব?

গোপীচন্দ্র কোন উত্তর করলেন না, রাধাকান্তের মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন।

রাধাকান্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, আপনার মন কি বলছে?

আমার মন বলছে, দেবতাকে আমি প্রতিষ্ঠা করি।

এবার হেসে রাধাকান্ত বললেন, তবে আর কি? তাই করুন। দেবতা কাঠেও নাই, পাষাণেও নাই, মৃন্ময় মূর্তিতেও নাই, অন্তরের ভাবের মধ্যে তাঁর বাস। আপনার ভাবনায় যখন তিনি ওই পাষাণমূর্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে বাইরে প্রকাশিত হতে চাচ্ছেন, তখন আর তাতে দ্বিধা কি?

ভয় দেখাচ্ছেন অনেকে।

কথা তো অনেকের নয়, কথা আপনার।

আপনার কথাটা আমি শুনতে চাই।

আমার কথা! একটু স্তব্ধ থেকে রাধাকান্ত বললেন, আমার কথা ওই ঠাকুরটি আপনার সৌভাগ্যের ষোলকলা পরিপূর্ণ করতে এসেছেন। ওতে আপনি দ্বিধা করবেন না।

গোপীচন্দ্র চ'লে গেলেন আশ্বস্ত হয়ে, খুশি হয়ে। রাধাকান্ত আবার ডায়েরি লিখতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বাধা পড়ল। বাউড়ীদের সাতনের মা এবং সাতন এসে দাঁড়াল। সাতনের মা ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদছে। ভ্রূ কুঁচকে রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, কি?

সাতন জোড়হাত ক'রে বললে, আজ্ঞে বাবু, আপনার কাছে নালিশ করতে এসেছি।

সাতনের মা কেঁদে উঠল এবার সশব্দে, আর আমাদের কেউ নাই হুজুর।

চুপ, চুপ কর্।—ধমক দিয়ে উঠল সাতন। তারপর সে বললে, গড়াঞীদের চন্দ গড়াঞী আমার বুনকে—

তোর বোন? পরী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ বাবুদের পুকুরে ঠাকুর উঠেছে, দোপর-(দুপুর)-বেলায়

আমার মা, আর পরী যেছিল (যাচ্ছিল) তাই দেখতে। দেরি হয়ে গিয়েছিল একটুকুন। লোকজন পথে কেউ ছিল না। পথে গড়াঞীয়ের দুয়োরে, গড়াঞীও তখুনি ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। পথে মাকে আর পরীকে একা পেয়ে, টেনে ঘরে ঢুকিয়ে নেয়। মা কি করবে—

রাধাকান্ত বললেন, আমিই বা এর কি করব? এ নালিশের বিচার আমি করতে পারব না।

আজ্ঞে, তবে আমরা কি করব? কোথা যাব?

তোদের জমিদার তো স্বর্ণবাবু?

সাত্তনের মা বললে, আজ্ঞে তিনি ইয়ের (এর) বিচার করবেন না।

সাত্তন বললে, তিনিই আপনকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, ওঁর কাছে যা।

রাধাকান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোরা গোপীচন্দ্রবাবুর কাছারিতে যা। তাঁকে গিয়ে বল্। আমি এ বিচার করতে পারব না।

সাত্তন, সাত্তনের মা চুপ ক'রে ব'সে রইল। রাধাকান্ত বললেন, আমার কাছে ব'সে থাকলে ফল হবে না বাপু। যাও। যা বললাম, তাই কর।

এবার সাত্তন বললে, আজ্ঞে বাবু, উনি আজ বড়নোক হয়েছেন, কিন্তুক আমাদের পুরনো রাজা তো আপনারা। তা ছাড়া বাবু, গাঁয়ের বেনে-বাস্তি এরা সব উ বাবুর পেটাও (অনুগত) নোক। চন্দ গড়াঞী বাবুর বড় ছেলে কীর্তিবাবুর ভারি বাধ্য।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার সে বললে, আপনকারা আমাদিগে খেতে দেন, পরতে দেন, আপনকাদের মাটিতে আমার বাস। আপনকাদের পুকুরে আমরা চান করি, জল খাই। আপনকারা না থাকলে বেনে-বাস্তিরা আমাদের নাঙনার (লাঙনার) আর বাকি রাখত না। আপনাদিগে বাদ দিয়ে উ বাবুর বাড়িতে যেতে পারব না।

রাধাকান্ত এবারও বললেন, এর বিচার আমি করতে পারব না বাপু।

সাত্তনের মায়ের ধৈর্য এবার ভেঙে পড়ল, সে মাটিতে বারকয়েক চাপড় মেরে সেই হাতে কপাল চাপড়ে কপালটাকে ধূলায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আক্ষেপের স্বরে ব'লে উঠল, তবে কি আর আমার মেয়ে উদ্ধার হবে না বাবু আপনারা থাকতে?

উদ্ধার? এখনও কি আটকে রেখেছে নাকি?

আজ্ঞে, চন্দ গড়াঞী নয় মাশায়। ঠাকুরপাড়ার পাতু হাজাম আর কোরবান শাক। চন্দ গড়াঞী যখন জবরদস্তি ক'রে ঘরে বন্ধ করলে পরীকে, তখন মাশায়, ওরা দুজনে আবগারী দোকান থেকে আফিং কিনে ফিরছিল। ওরা দেখেছিল ব্যাপার-স্যাপার।

চন্দ্র গড়াঞী পরীকে মুক্তি দেবার জন্ত গৃহদ্বার উন্মুক্ত করবামাত্র তারা এসে উপস্থিত হয়, কলুষ ঘটনার ভয় দেখিয়ে বীভৎস উল্লাসে চীৎকার করতে থাকে। বলে, চীৎকার

ক'রে লোক জমায়েৎ ক'রে চন্দ্র এবং পরী দুজনকেই টেনে নিয়ে যাবে ওই দিঘির চারিপাশে সমবেত জনতার সম্মুখে। অবশেষে চন্দ্র একটি টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পায়, এবং পরীকে সম্মত হতে হয় দেহদানে।

সাত্তনের মা কেঁদে উঠল এবার, বললে, বাবু মাশায়, সেই নিয়ে গিয়েছে মেয়েকে, এখনও সে আমার ফিরল না।

রাধাকান্ত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বাসুদেব দেবমূর্তিটির এই আকস্মিক উত্থানে তাঁর মন এক পবিত্র ভাবলোকে বিচরণ করছিল। তাকে বার বার রূঢ় কদর্য আঘাত ক'রে এই অশ্লীল পাপকাহিনীর বর্ণনা তিনি আর শুনতে পারছিলেন না। এই হতভাগ্য অস্পৃশ্য জাতিগুলার জীবনে এ প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি বৎসরই এমন দু-চারটে ঘটনা ঘটে। অন্তরালে কত ঘটে, সে হিসাব এক ভগবান জানেন। প্রকাশ্যে দু-চারটে যা ঘটে, তাতে শোনা যায়, কোন বাবুর কোন মুসলমান চাপরাসী এদের কোন মেয়েকে নিয়ে চ'লে গিয়েছে। কাটাকাপড়-ফিরিওয়ালারা আসে, দু-এক বৎসর অন্তর তারাও নিয়ে যায় একটা দুটো। স্থানীয় মুসলমানপাড়ার ছোকরাদের সঙ্গেও এদের প্রণয়ের কথা শোনা যায়। চ'লেও যায় দু-একটা মেয়ে। পরীকে আজ তারা ভয় দেখিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছে এইমাত্র ব্যতিক্রম। এর আর তিনি কি করবেন? একটু চিন্তা ক'রে রাধাকান্ত বললেন, এক কাজ কর্। শেখপাড়ার হাজীকে বল্ গিয়ে সব কথা। আমার নাম করিস। বুঝলি? হাজীসাহেব বার ক'রে দেবে মেয়ে। না হয়, আমার লোককে সঙ্গে নিয়ে যা।

আজ্ঞে বাবু, চন্দ গড়াঞীয়ের তা হ'লে সাজা হবে না?

চন্দ্র গড়াঞী, চন্দ্র গড়াঞী! যত আক্রোশ এদের ওই গড়াঞী-সাহা-গন্ধবণিকদের উপর। আশ্চর্য। গড়াঞী-বণিকদের বিরোধিতা স্বর্ণ তিলি প্রমুখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে। বণিকরা আশ্রয় করছে গোপীচন্দ্রকে। এই হতভাগ্যেরা আশ্রয় চাচ্ছে তাঁদের। গোপীচন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে, স্বর্ণ শ্যামাকান্ত বংশলোচন,—শুধু তাঁরাই বা কেন, তিনিও তো রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। হ্যাঁ, রয়েছেন। সে সত্য তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল, 'পিঠোপিঠি' চার ভায়ের সংসারের দ্বন্দ্ব। বড়র সঙ্গে ঝগড়া মেজোর, মেজোর সঙ্গে সেজোর দ্বন্দ্ব; সেজোতে বড়তে দ্বন্দ্ব নাই; সেজোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছোটর; ছোটর সঙ্গে সদ্ভাব মেজোর। বড় ভাই অনেক বড়, তাই ছোটর সঙ্গে তার বিরোধ না থাকলেও ছোট তার কাছে ঘেঁষে না। বড় ভাই সংসারের সেরা জিনিস খায় মাথে পরে, মাছের মুড়ো তারই পাতে পড়ে; মেজো ভাই ঈর্ষা করে, ঘৃণায় উচ্ছিষ্ট খায় না, দয়া ক'রে ভেঙে খানিকটা দিতে গেলেও তা গ্রহণ করে না; সেজো ভাই

সানন্দে ব'সে যায় বড়র পাতে; ছোটর হাত থেকেও কেড়ে খায় তার ভাগের সামগ্রী দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে; ছোট মেজোর আশ্রয় নেয়, বড় সেজোকে স্নেহ করে ব'লে সে বড়র কাছ ঘেঁষে না। মেজো তাকে উচ্ছিষ্ট দেয়, ছোট তাতেই কৃতজ্ঞ। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের একাত্মতা, ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নের, রামায়ণে রামে ভরতে, লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নে বিরোধ নাই এ কথা সত্য, কিন্তু রামের সঙ্গে ভরতের প্রেম, রাম-লক্ষ্মণের প্রেমের চেয়ে গাঢ় নয়। সংসারের এই বোধ হয় নিয়ম।

সাতন আবার বললে, বাবু!

রাধাকান্ত বললেন, চন্দ্রকে সাজা দিতে হ'লে থানায় যাও, ডায়রি কর, কেস কর। তুমিই বলছ, কীর্তিচন্দ্রের 'পেটাও' লোক চন্দ্র গড়াঞী। আমি লোক পাঠালে সে যদি কীর্তিবাবুর আশকারায় না আসে, না মানে আমাকে?

তবু তারা গেল না। এবার রাধাকান্ত ধমক দিয়ে উঠলেন, যাও, যাও তোমরা এখান থেকে।

চমকে উঠল সাতন এবং সাতনের মা। আর তাদের থাকতে সাহস হ'ল না। ধীরে ধীরে চ'লে গেল তারা। রাধাকান্ত আবার ডায়েরি লিখতে বসলেন।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

8

And this defendant further answering saith that the said Talook of Nangoorparah was purchased by one Juggomohun Mozendar for and on account of this defendant and out of the monies of this defendant in the Bengal year One thousand two hundred and ten from Manickram Dutt and others and that the said Talook of Beerlook was sometime in the Bengal year One thousand two hundred and fifteen and that the said Talook called Kissenagar was sometime in the Bengal year One thousand two hundred and sixteen respectively purchased by the said Rajiblochun Roy for and on account of this defendant And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant laid out considerable or any sums of money belonging to any joint funds as in the Complainants Bill is untruly alleged either in making into a garden a certain piece of ground which belonged to any joint estate situate at Rogoonauthpore in the Pergunnah Jahanabad and

Zillah of Burdwan aforesaid or in the constructing of a certain house thereon for this defendant positively saith therewhere no joint funds or joint estate in which this defendant and the said Juggomohun Roy were interested after the partition hereinbeforementioned but this defendant further answering saith that he this defendant at various times by his said agent Juggernauth Mozendar did pay lay out and expend various sums of money out of the funds which exclusively belonged to this defendant in making into a garden a certain piece of ground at Rogoonauthpore aforesaid which was the sole and separate property of this defendant and also in building and constructing of a certain house in the last mentioned piece of ground so being separate property of this defendant at Ragoonauthpore aforesaid But this defendant further answering saith that the said last mentioned house was not begun to be built until after the death of the said Juggomohun Roy And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant purchased several pieces or parcels or any piece or parcel of rent free or Barmutter ground situate at Kissenagore and in the said pargunnah Jahanabad in the Zillah of Burdwan aforesaid containing about three hundred Biggahs or any other quantity and of the value of Sicca Rupees Six thousand or of any other value And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant purchased a certain other Putteney Talook called Serampore in purgunnah Boorsut in the Zillah of Burdwan aforesaid of the value of Sicca Rupees Five thousand or thereabouts or of any other value and this defendant further answering saith as the truth is that the said Juggomohun Roy had not at any time any interest whatsoever in the last mentioned Talook and that the same was purchased by the said Juggernauth Mozendar in his own name but with the proper money and for and on the account of this defendant exclusively from one Ramdhun Chatterjee for the price or sum of Sicca Rupees Seven hundred and twenty five and this defendant further answering saith that this defendant either separately or jointly did not at any time purchase any Bremuttar ground whatsoever and that this defendant hath not at any time heretofore been possessed of or entitled to any Bremuttar ground except that which was allotted to him this defendant by his father in and by the aforesaid instrument of partition And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant in the lifetime of the said Juggomohun Roy were seized and possessed to them and their heirs for ever as tenants in Common according to the Laws and usages of the Hindoos or otherwise of and in the several lands Talooks and premises which in and by the Complainants said Bill are untruly alleged to have been

purchased by the said Juggomohun Roy and this defendant out of their joint funds or that the said Juggomohun Roy and this defendant were seized and possessed of the said two several Talooks called Govindpore and Rammissorpore in the Zillah of Burdwan aforesaid also untruly alleged to have been purchased during the lifetime of the said Ramcaunt Roy out of joint funds and this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy in his lifetime at any period subsequent to the said partition was jointly entitled with this defendant to or had any common interest with this defendant in any lands Talooks or premises whatsoever except the Common interest which the said Juggomohun Roy and this defendant continued to have in virtue of the said partition in the aforsaid house at Nangoorparah to the joint possession of which they were entitled but which they did not in fact jointly possess otherwise than as is hereinbefore in that behalf mentioned and this defendant further answering saith that the said Juggomohun Roy during his lifetime continued to manage for his own sole and separate use such part of the estate which formerly was of the said Ramcaunt Roy as he was by the said instrument of partition entitled unto and also such other estate asd property as the said Juggomohun Roy afterwards gained or acquired by his own separate exertions and dealings and that he the said Juggomohun Roy during his lifetime after the said partition on his own private and separate account and without any connection or communication with this defendant purchased and paid for certain lands which he afterwards held and enjoyed in his own name and for his own benefit and under his own exclusive authority and control in which last mentioned lands this defendant was not at any time or in any manner interested

ক্রমশ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

কি আশ্চর্য! লোকটা কয়েক সেকেণ্ড সেই রকম কটমট দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চেয়ে থেকে বললে, আচ্ছা দেখে নেব।

তারপর কোমরে সেই ছোরা-গোঁজা অবস্থাতেই নিজের বিছানায় গিয়ে দড়াম করে শুয়ে পড়ল।

কাপুরুষদের হালচাল সর্বত্রই এক রকম।

বড়ো ভাই শুয়ে পড়তেই আয়নাটা দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি পরিতোষের পাশে এসে বসলুম। দেখলুম, লোকটা বার পাঁচ সাত পাশ-বালিশ

জড়িয়ে এপাশ ওপাশ ক'রেই একবার চিত হয়ে স্থির হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল দেখে আমরা আমাদের বিছানার চাদরটা টেনে-টুনে ঠিক ক'রে পেতে শুয়ে পড়বার আগে দুজনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলুম।

বিড়ি টানছি আর ফিসফিস ক'রে কথা বলছি। পরিতোষ বলতে লাগল, এই মালকে নিয়ে রাত কাটানোর চেয়ে আবার সরাইয়ে ফিরে যাই চল্। বাবা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

আমি বললুম, কাল দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা করবার করা যাবে।

পরিতোষ বললে, আমি বিশুদাকে বলব।

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বড়কর্তা ঘুমের ঘোরেই চীৎকার ক'রে উঠল, মারুঙ্গা শালেকো বিছুয়া—একদম জান্‌সে মার দুঙ্গা।

চমকে উঠে একটু দূরে স'রে গেলুম। তারপর ছুরি মারব, কাটারি মারব, জ্যান্ত পুঁতে ফেলব প্রভৃতি ভয়ানক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হুঙ্কার চলল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। আমরা তো কাঠ হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে রইলুম।

চীৎকার থেমে গেলে কোনও আওয়াজ না ক'রে সন্তর্পণে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে বড়কর্তার নাকডাকা শুরু হ'ল। বাপ্‌রে! সে কি আওয়াজ! বিছুয়া মারুঙ্গা, জিন্দা গাড় দুঙ্গা প্রভৃতি গর্জন তার কাছে কিছুই নয় বললেই চলে। তাও যদি একটানা নাকডাকা হয় তো সে কোন রকমে সহ্য করা চলে। এ যেন থেকে-থেকে মনে হতে লাগল কে যেন তার গলাটা টিপে দম বন্ধ ক'রে মারছে। এ শ্রেণীর বিপদে এর আগে কখনও পড়ি-নি। ঠায় জেগে ব'সে থাকতে-থাকতে স্রেফ ক্লান্তিতে শেষ রাত্রের দিকে এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হতে না হতে অন্য দিনের মতন দিদিমণি ঘরের মধ্যে এসে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, কি রে, এখনও ঘুমুচ্ছিস্, ওঠ্, ওঠ্।

সারারাত জেগে মাথা তখনও অসম্ভব ভারী বোধ হচ্ছিল, তবুও দিদিমণির আওয়াজ পেয়ে উঠে বসলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানার কাছে এসে বললে, কি রে, এখনও শুয়ে! শরীর ভাল তো?

তারপরে আমাদের লেপের এক ধারটা তুলে বিছানায় বসতে গিয়েই বললে, এ কিসের দাগ রে! এত রক্ত এল কোথা থেকে?

বড় কর্তা কোন্ ভোরে উঠে চ'লে গিয়েছিল, তা আমরা জানতেও পারি নি।

আমরা প্রথমটা কোন কথাই বলতে পারলুম না। দিদিমণি আবার বললে, এ তো রক্তেরই দাগ দেখছি!

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। আমি গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত আস্তে আস্তে তাকে খুলে বললুম। সে ইতিহাস শুনতে শুনতে দিদিমণির মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক চুপ ক'রে থেকে সে বললে, ললিত ও সুদনের পেছনেও ও ওই রকম ক'রে লাগত।

আমরা আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানায় না ব'সে একটু দূরে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়ল।

সব চুপচাপ। বাইরের ছাতে কুয়াশা ও সূর্যকিরণের জাল-বোনা চলেছে, সেই দিকে চেয়ে আছি—চোখ দেখছে এক, মন ভাবছে আর। এমন সময় চমক ভাঙিয়ে দিয়ে দিদিমণি অতি করুণস্বরে বললে, আমাকে একবার খবর দিতে পারলি নে?

বললুম, ঘর থেকে বেরুতেই পারলুম না।

দিদিমণি ম্লানমুখে আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চীৎকার ক'রে ডাকতে আরম্ভ করলে, শঙ্কর, ভরত, আহিয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি!

দেখতে দেখতে বাড়িসুদ্ধ ঝি, চাকর, ঠাকুর, পাহারাদার, এমন কি গরুর চাকরেরাও পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। দিদিমণি পাগলের মত হিন্দী, উর্দুতে কি সব বলতে লাগল তাদের। তারপরে ছুটতে ছুটতে বিশুদার ঘরে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে, তার কিছু বুঝলুম, কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারলুম না। একটা কথা বার বার শুনতে পেলুম, আজ বাবুজী আসুন!

চাকরবাকর সব সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ করতে লাগল, আর আমরা দুটিতে সেই রক্তাক্ত বিছানায় ব'সে ব'সে দুধ আর জিলিপির অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ওদিকে রোদ উঠে গেল। ব'সে ব'সে দেখছি, চাকরেরা ছাতের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে, কোথায় বা দুধ আর কোথায় বা গরম জিলিপি!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কিছুই এল না দেখে বিশুদার ছাতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

আমাদের দেখে বিশুদা বললে, শুনলুম, কাল রাতে আমার বড় ভাইটা এসে খুব হাঙ্গামা মাচিয়েছিল। দিদিমণি তো ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছে, সকাল-বেলা এসে আমাকে খুব গালিগালাজ ক'রে গেল।

বিশুদার আড্ডায় লোকসমাগম হতে আরম্ভ হ'ল। সেই বিড়ির শ্রাদ্ধ আর ছোটে সাহেব—ছোটে সাহেব।

সেদিন লক্ষ্য করলুম, বিশুদার অনেক বন্ধুর সঙ্গেই পরিতোষের বেশ ভাব জমেছে। এই কদিনের মধ্যে সে-ও হিন্দী উর্দু বলতে আরম্ভ করেছে। তার উর্দু বলবার ভঙ্গী শুনে আমার হিংসে হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের দুজনের জন্যে দু কাপ চা নিয়ে আহিয়া এসে হাজির হ'ল। চা-পান হওয়া মাত্র আহিয়া বললে, তোমায় ভেতরে ডাকছে।

আহিয়া চ'লে গেল। বিশুদা আমাকে বললে, দিদিমণিকে তোমাদের আলাদা ঘর ক'রে দিতে বলবে। নইলে আমার বড় ভাইটা সুবিধের লোক নয়। নেশার ঝোঁকে হয়তো সত্যি সত্যিই কোন্ দিন বিছুয়া মেরে দেবে। নেশাখোরকে বিশ্বাস নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, বড়দা কি নেশা করেন?

বিশুদা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বললে, জিজ্ঞাসা কর যে, কি নেশা করেন না! ভোরবেলা থেকে ঠার্‌রা (দিশী মদ) তো লেগেই আছে। তার ওপরে গাঁজা, আফিম, চরস ও কোকেন তো রোজ চাই। তা ছাড়া বাবুজীর দাওয়া-খানায় আরও কত রকমের নেশার জিনিস আছে, তার সব নাম আমার জানা নেই। ও একটা ভয়ানক লোক, সাঁপের বিষ পেলে চেটে লিতে পারে—

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় আহিয়া আবার এসে বললে, তোমাদের দুজনকেই ভেতরে ডাকছে।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলুম, দিদিমণির ঘরের সঙ্গে একেবারে লাগা এক-খানা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর থেকে মালপত্র বের ক'রে সেটা ধোয়া পোঁছা হয়েছে। ভরত, শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। দিদিমণি গাছকোমর বেঁধে এক ধারে দাঁড়িয়ে হুকুম চালাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দুখানা খাট পেতে তার ওপরে বিছানা পাতা হয়েছে। একটা

নতুন 'ডিট্‌মারে'র দেওয়ালগিরি ও একখানা বড় চৌকোণা আয়না দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। এক ধারে একটা বেঁটে সুদৃশ্য দেরাজ। দিদিমণি দেরাজটা দেখিয়ে বললে, এর মধ্যে তোমরা কাপড়-চোপড় রাখবে। তারপর বললে, কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে?

বললুম, চমৎকার ঘর।

দিদিমণি ভরত ও শঙ্করকে বললে, মেঝেতে একটা নতুন দরি পেতে দাও।

তারপরে আমার হাত ধ'রে পরিতোষকে বললে, আয় আমার ঘরে।

নিজের ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে দিদিমণি একটা বড় আলমারি খুললে। দেখলুম, আলমারির মধ্যে থাকে থাকে বোধ হয় পঞ্চাশটা হাতবাক্স সাজানো রয়েছে। দিদিমণি বললে, দেখ্, এগুলোর মধ্যে সব গয়না আছে। আমাদের বাবার ঠাকুরমা থেকে আমার পর্যন্ত এই চার পুরুষের গয়না। দু-তিন মাস অন্তর এই বাক্সগুলো খুলে আমি দেখি, সব ঠিক আছে, না খোয়া গেছে। আজ দুপুর-বেলা আর ঘুমোনো হবে না—এগুলো সব দেখতে হবে। এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি তোদের। দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে সোজা চ'লে আসবি এই ঘরে, কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণির ঘরে গিয়ে ঢুকলুম আর প্রায় গুটি পঞ্চাশেক বাক্সের গয়না মিলিয়ে হিসাব ক'রে যখন তোলা হ'ল, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। সে বোধ হয় তখনকার দিনের হিসেবে প্রায় লক্ষ টাকা দামের গয়না। প্রত্যেকটি হার, বাজু, জশম, রতনচুড় ও কানবালার বিচিত্র ইতিহাস! এক-একটি গয়না এক-একটি ছোট গল্প, আমি অতি অলস তাই সেসব কাহিনীর রূপ দিতে পারলুম না, না হ'লে সেই গয়নার বাক্সগুলোর ওপরেই একটা বড় সাহিত্য রচিত হতে পারত। অতীত দিনের কত হাসি ও অশ্রু যে সেগুলোর সঙ্গে জড়িত, সে দিন হাল্‌কা হাসির সঙ্গে যে রূপকথা শুনেছিলুম, তার কিছু মনে পড়ছে, কিছু পড়ছে না। পরিতোষও বেঁচে নেই যে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করতে পারি। একটা কাহিনীর কথা আজও মনের মধ্যে জলজল করছে, সেই কথাই উল্লেখ করছি।

একটা ছোট হাত-বাক্স থেকে একটা হার বের ক'রে দিদিমণি দাঁড়িয়ে উঠে হারছড়া নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিলে। দেখলুম, হারগাছা একেবারে তার পা

অবধি লুটিয়ে পড়ল। দিদিমণি ব'সে গলা থেকে হারটা খুলে আমাকে বললে, এটা কতদিনের পুরোনো বলতে পারিস?

গয়না সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলুম, আজও সে অজ্ঞতা কেটেছে এমন কথা বলতে পারি নে। আমার মার কানের ডিম থেকে ডগা অবধি প্রতি কানে পাঁচটা ক'রে ফুটো ছিল, কিন্তু একটা ফুটোতেও কখনও দুল, মাকড়ি কিংবা টাপ কোন দিন দেখি নি, তার কারণ তাঁর জোটে নি। দু হাতে চারগাছা ক'রে চুড়ি আর এক হাতে একটা এক পয়সা দামের লোহা, এই ছিল তাঁর অলঙ্কার। আমরা লায়েক হয়ে মার লোহা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলুম। দু-তিনগাছা হার তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু তা পরত মেয়েরা। আমার অন্য মা (পিসীমা) ছিলেন বিধবা, তাই গয়নার বালাই তাঁর অঙ্গে ছিল না। আমার বড়দির স্বামী সে যুগে নশো টাকা মাইনে পেতেন, যার দাম আজকের দিনে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা। দিদির অঙ্গেও চারগাছা ক'রে চুড়ি, দুগাছা অমৃতি পাকের বালা, গলায় একটা চিক্‌চিকে সরু হার, কানে দুটো টাপ, আর বাঁধানো লোহা, আজকের দিনে সোনার দাম পাঁচ গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অতি গরিব ঘরেও যা তুচ্ছ ব'লে বিবেচিত হয়, তা ছাড়া আর কোনও গয়না তাঁর অঙ্গে দেখি নি। আমাকে গয়না সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা বৃথা। সেই হারগাছার রং মলিন হয়ে গেলেও বুঝতে পারলুম, সেটা সোনার বটে, কারণ সোনা ছাড়া যে ভদ্রলোকের মেয়ের গয়না হয় না, সে জ্ঞান ছিল টন্‌টনে।

হারগাছা আমার হাতে দিয়ে দিদিমণি বললে, ওজনটা দেখ্।

আমার মনে হ'ল, সেটা প্রায় আধ সের ভারী হবে। কিন্তু দিদিমণি বললে, আধ সেরের চেয়েও বেশি। এটার ওজন পঞ্চাশ ভরিরও কিছু বেশি হবে।

দিদিমণি বলতে লাগল, এই হারগাছা আমার ছোট্‌ঠাকুমার অর্থাৎ বাবুজীর ছোট কাকীর। বাবুজীর ঠাকুরদাদা নিমকির দেওয়ানি, কমিসারিয়টে চাকরি ও নানা রকম ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা রোজগার ক'রে পশ্চিমে বড় জমিদারি করেছিলেন। অবিশ্যি তাঁর বাবাই প্রথমে পশ্চিমে আসেন, ইংরেজ তখনও এ দেশের রাজা হয় নি।

বাবুজীর ঠাকুরদা চারটে নাবালক ছেলে রেখে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর

বয়সেই মারা যান। আমাদের বড়মার বয়স বোধ হয় তখন ত্রিশ হবে। সেই থেকে তিনি নিজের হাতে বিস্তর সম্পত্তি নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারি চালাতে লাগলেন। ছেলেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে তাদের বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন। কিন্তু ছোট ছেলের বিয়ে আর দিতে পারেন না। সবার ছোট হওয়ার ফলে আদর পেয়েছিলেন তিনি বেশি। তাই দাদাদের ও মায়ের আদরে তাঁর দেহ যেমন বাড়ল, বিদ্যে-বুদ্ধি সেই অনুপাতে কিছুই হ'ল না। অনেক ঘটক ঘটকী লোকজন লাগানোর পর বাংলা দেশের এক ব্রাহ্মণের ঘরে ছোট্‌ঠাকুরদার বিয়ের ঠিক হ'ল। কুলীন তাঁরা, মেয়ের বয়েস প্রায় সতেরো, অতি গরিব, তাই পশ্চিমের বড়লোকের মুখ্যু ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন তাঁরা।

আমার বড়মা সব ছেলেদেরই পাঠিয়ে দিলেন সেখানে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে একেবারে বউ নিয়ে যেন চ'লে আসে।

তখনকার দিনে নৌকো ও গাড়ি চ'ড়ে যাতায়াত করতে হ'ত। সেখানে পৌঁছতে প্রায় দু মাস সময় লাগত।

ছোট্‌ঠাকুমার বাপেরা উচ্চ ও পণ্ডিতের বংশ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গতি ছিল অল্প। তার ওপরে ভদ্রলোক চার-পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে এমনিতেই কাত হয়ে পড়েছিলেন। ওদিকে বড়লোকের বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। সে বাড়ির গিন্নীর কড়া মেজাজ ও খাণ্ডারবানীত্বের কিছু কিছু সংবাদও তাঁরা শুনতে না পেয়েছিলেন তা নয়। এদিকে কোনও সঙ্গতি নেই, তার ওপরে এর পরেও আর একটি মেয়ে, যদিও সে তখনও নেহাৎ শিশু। ভাবনা-চিন্তায় ভদ্রলোক একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন।

তাঁরা ছিলেন শাক্ত। পুরুষানুক্রমে বাড়িতে সাড়ে তিন হাত উঁচু অষ্টধাতুর এক কালীমূর্তি পূজিতা হতেন। আর কোন উপায় না দেখে তিনি গৃহবিগ্রহের পায়ের ওপর প'ড়ে বললেন, মাগো! বংশপরম্পরা ধ'রে আমরা তোর সেবা ক'রে আসছি, কখনও তোর কাছে কোনও ভিক্ষে চাই নি। এবার আমায় উদ্ধার কর্, নইলে তোর পায়ের তলায় প'ড়ে না খেয়ে মরব।

সেই রাত্রে মা তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, দেখ্, আমার গলায় যে লম্বা হারগাছা আছে, সেইটে ভাঙিয়ে মনোজবার গয়না গড়িয়ে দে। আমার ছোট্‌ঠাকমার নাম ছিল মনোজবা।

বিয়ের দিন ভদ্রলোক আমার বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার বাবার বাবার হাতে এই হারছড়া দিয়ে বললেন, আমার আর সঙ্গতি নেই; আপনারা বড়লোক, যদি ইচ্ছে হয় তো ভাদ্রবউকে এইটি ভেঙে গয়না গড়িয়ে দেবেন, নয়তো নিজেদের গৃহবিগ্রহের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভাল লোক আর ছোট্‌ঠাকুমা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। মেয়ে দেখে তাঁরা আর কোনও আপত্তি না ক'রে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বউ ও তার সঙ্গে এই হারগাছা নিয়ে বাড়ি চ'লে এলেন।

আগেই বলেছি, বড়মার ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ ও বচন ছিল অতি কঠিন। বউরা শাশুড়ীর ভয়ে একেবারে তটস্থ থাকতেন। ছোট্‌ঠাকুমা বাড়িতে পা দিতে না দিতে তাঁর বাপের বাড়ির দারিদ্র্য উল্লেখ ক'রে খোঁটা দিতে শুরু করলেন। অথচ আমরা মায়ের কাছে শুনেছি যে, আমাদের বড়মার বাপেরা এত গরিব ছিল যে, তাঁকে টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয়েছিল, সেই ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নিয়ে আসার ফলে আমাদের এতবড় বংশ লোপ হয়ে গেল।

যা হোক, ছোট্‌ঠাকুমা ছিলেন খাস বাংলা দেশের মেয়ে। মাস কয়েকের ভেতরেই তিনি বাড়ির বউদের মধ্যে এমন একটা স্বাধীনতার আবহাওয়া এনে ফেললেন যে, তারা শাশুড়ীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটু আধটু প্রতিবাদ করতে শুরু ক'রে দিলে।

আমাদের ছোট্‌ঠাকুরদা ছিলেন অতিশয় ভীরুপ্রকৃতির লোক। তিনি না পারতেন মার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে, না পেরে উঠতেন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে।

শেষকালে কোন উপায় না দেখে সে বেচারী প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষার জন্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া বসন প'রে বাড়ির এক কোণে নিরালা একখানা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। এজন্য বড়মা ছোট্‌ঠাকুমার ওপর আরও চ'টে গেল। দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি, বাড়ি একেবারে অশান্তির আগার হয়ে উঠল। সারাদিন ধ'রে বাড়ির গিন্নী ছোট বউয়ের নামে ছেলেদের কাছে নালিশ করেন, ওদিকে সারারাত ধ'রে বউয়েরা নিজেদের স্বামীর কাছে বলতে থাকে, ছোট যা করে ঠিকই করে। অন্য বউ হ'লে তোমাদের মাকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত। বিষয় তোমাদের, তোমার মায়ের নয়। মাঝে থেকে স্বামীদের জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ।

ছোট্‌ঠাকুরদার সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। তিনি দিনরাত নিজের ঘরে জপতপ করেন, কিন্তু ছোট্‌ঠাক্‌মার কাছে তাঁর ওসব বুজরুগি চলত না। তিনি স্বামীকে বলতেন, ওসব ভণ্ডামো তোমার মায়ের সঙ্গে চালিও, সন্ন্যেসী হবার ইচ্ছে ছিল তো বিয়ে করেছিলে কেন?

ছোট্‌ঠাক্‌মা রোজ রাত্রি দশটার সময় জোর ক'রে ছোটঠাকুরদার ঘরে ঢুকে কোন দিন মাঝরাত্রে আর কোনদিন বা সারারাত্রি ধ'রে তাঁর স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার ক'রে তবে বেরুতেন।

এই রকম দশ-পনেরো বছর চলবার পর একবার ছোট্‌ঠাক্‌মার বাপের বাড়ি থেকে দুখানা চিঠি এল—একখানা তাঁর নামে আর একখানা বড়মার নামে। তাঁরা লিখেছেন, ছোট বোনের বিয়ে, যদি আসতে পার তো সুখী হব। তুমি বড় ঘরের বউ হয়েছ, এর চেয়ে বেশি অনুরোধ করা আমাদের শোভা পায় না।

ছোট্‌ঠাক্‌মা বললেন, বাপের বাড়ি যাব।

বড়মা বললেন, বাপের বাড়ি থেকে চিঠি এলেই কি সেখানে যেতে হবে নাকি? অত আবদার চলবে না।

ছোট্‌ঠাক্‌মা কোন কথা না ব'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বড়মা বললেন, মরুকগে, আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

ছোট্‌ঠাক্‌মা সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন, সাত দিন না খাওয়া না, কিছু।

আমার ছোট্‌ঠাকুরদা উদাসীন। স্ত্রী খেলে কি না-খেলে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। প্রতিদিন নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে যথারীতি দরজা দিতে লাগলেন, একবার স্ত্রীর ঘরে উঁকি মেরেও দেখেন না, লোকটা ম'রে গেল কি না!

আমার নিজের ঠাকুরদার নাম ছিল সদাশিব, চরিত্রেও ছিলেন তিনি সদাশিব। বাড়ির ছোট বউ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, বাড়িসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সকলেই উদাসীন, শুধু মেজো ঠাকুরদার দুই ছেলে দিনরাত ছোট কাকীর মাথার দু পাশে ব'সে হাওয়া করছে আর কাঁদছে। আর কেউ সেদিকে উঁকি মেরেও দেখে না। বাড়ির গিন্নী তো গৃহ-দেবতার কাছে দু বেলা মানত করছেন, নারায়ণ এই যেন ওর শেষ শোওয়া হয়।

এই রকম চলেছে; এমন সময় একদিন রাত-দুপুরে আমাদের বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরদা স্ত্রীর মুখে সব শুনে তখুনি স্ত্রীর সঙ্গে ছুটলেন ছোট বউয়ের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে ভাদ্দর-বউকে নিজের হাতে বিছানায় বসিয়ে আদর করতে করতে বললেন, মা-লক্ষ্মী! তুমি আমার কুলবধূ। এ রকম ক'রে না খেয়ে মরলে যে আমার অকল্যাণ হবে মা। কি চাই তোমার আমাকে বল।

ছোট্‌ঠাক্‌মার অবস্থা তখন খারাপ। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার ছোট বোনের বিয়ে, আমি বাপের বাড়ি যাব।

ঠাকুরদা বললেন, এই কথা! তা আমাকে এতদিন জানাও নি কেন মা? আমি তোমায় নিজে নিয়ে যাব সেখানে; তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।

সেই রাতে একটু একটু ক'রে গরম দুধ খাইয়ে ছোট্‌টাক্‌মাকে চাঙা ক'রে তিনি নিজে তাঁকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এসে নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে কয়েকদিন শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন।

এদিকে বাড়িময় ঢিঢি-ছিছি প'ড়ে গেল। ভাশুর হয়ে ভাদ্দর-বউয়ের অঙ্গ স্পর্শ করার জন্যে মেয়ে-মহলে শুরু হ'ল তুমুল আন্দোলন, এই আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন বাড়ির গিন্নী, আমাদের বড়মা।

বড়মা ছোট ছেলের কাছে গিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী ও নিজের বড় ছেলের নামে মিলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে যা-তা কুৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু ছোট কর্তা নির্বিকার, মুখে ভালমন্দ কোন কথা নেই, নির্দিষ্ট সময়ে স্নান ও আহার সেরে তিনি প্রতিদিন যথাসময়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিতে লাগলেন।

দিন কয়েকের মধ্যে ছোট্‌ঠাকুমা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। নৌকো ঠিক হয়ে গেল। সন্ধ্যাকালে যাত্রার শুভমুহূর্ত।

যাত্রার দিন সকালবেলা স্নান ক'রে ছোট্‌ঠাক্‌মা গিয়ে ঢুকলেন ছোট্‌-ঠাকুরদার ঘরে। সেই যে দরজা বন্ধ হ'ল আর সারাদিন খুলল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট্‌ঠাক্‌মা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার নিজের ঠাকুরমা, ঠাকুরদা আর ছোট্‌ঠাকুরমা সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরই বেরিয়ে পড়লেন নৌকোয়, সুদূর বাংলা দেশের এক গ্রামের উদ্দেশে, প্রকৃতি অনুকূল হ'লেও যেখানে পৌঁছতে সেকালে অন্তত চল্লিশ দিন লাগত।

যা হোক, ছোট্‌ঠাকুরমা তো বাপের বাড়ি পৌঁছলেন, তখনও তাঁর বোনের

বিয়ের আট-দশ দিন দেরি আছে। ছোট বোনের বিয়ে, তাই সব বোনেরাই বাপের বাড়িতে এসে জুটেছিল, গরিবের ঘরে আনন্দ-উৎসবের আর অন্ত নেই। কথায় বলে, নদীতে নদীতে মিলন হয়, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর বোনে বোনে আর মিলন হয় না। তাই এতদিন পর সব বোন একত্র হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণের ঘরে আনন্দের প্রবাহ ছুটল।

এই সময়, বিয়ের বোধ হয় দিন দুই আগে তাঁদের বাড়িতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। আগেই বলেছি, ছোট্‌ঠাকুরমাদের বাড়িতে পূর্বপুরুষের এক কালীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিন সকালে তাঁর জেঠামশাই পূজো করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, ঠাকুরাণীর গলায় সেই সোনার হারগাছা ঝুলছে, অনেকদিন আগে ছোট্‌ঠাকুরমার বিয়ের জন্যে যেটিকে তাঁর গলা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল।

সংবাদ পেয়ে দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল তাঁদের বাড়িতে। সবাই সে কাণ্ড দেখে অবাক, তারস্বরে সবাই চীৎকার করতে লাগল, জয় মা কালী! এমন জাগ্রত দেবী কালীঘাটেও নেই।

সেদিন গভীর রাত্রে ছোট্‌ঠাক্‌মার বাবা তাঁকে ঘুম থেকে তুলে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মনোজবা, এ কাজ তুই কেন করলি মা? তোর শাশুড়ী জানতে পারলে তো আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে, আর তোমাকে আস্ত রাখবে না।

ছোট্‌ঠাক্‌মা ন্যাকা সেজে বললেন, কি করেছি বাবা?

সেই হারগাছা এনে তুই মায়ের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিস!

ছোট্‌ঠাক্‌মা বললেন, কে বলেছে এ কথা! সে হার তো আমার শাশুড়ীর সিন্দুকে বন্ধ আছে। এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও আমি জানি নে।

আতপচাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ-খেকো বামুনের আর কত বুদ্ধি হবে! ছোট্‌ঠাক্‌মা যা বললেন, তিনি তাই বিশ্বাস করলেন।

এসব গল্প ছোট্‌ঠাক্‌মা আমার বড়ঠাক্‌মা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাক্‌মার কাছে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর বড় বউকে অর্থাৎ আমার মাকে, মার মুখে আমরা শুনেছি।

যা হোক, বোনের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাবার পর ছোট্‌ঠাক্‌মা তো শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলেন। শাশুড়ীর বিনা হুকুমে বাপের বাড়ি যাওয়ার অপরাধে এখানে

নানাভাবে তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু হ'ল। শুধু তিনি নন, তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরমাকেও উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হতে লাগল। বড়মা এবার একটা নতুন চাল চাললেন। তিনি মেজো ছেলে ও মেজো বউকে বড় ছেলে ও বড় বউয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

ওদিকে অসম্ভাবিতরূপে হার ফিরে আসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য ক'রে ছোট্‌ঠাকুরমার বাপের বাড়ির অবস্থার হু-হু ক'রে উন্নতি হতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকে এই ঘটনার কথা পল্লবিত হয়ে রটতে লাগল। দূর-দূরান্তর থেকে লোক এসে এ-হেন জাগ্রত কালীর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে পূজো দিতে লাগল। যে দেবী সর্ববসনবিবর্জিতা হয়ে নিজের শিবকে পদদলিত করেছেন, নরকপাল যাঁর গলায়, যিনি কপালকুণ্ডলা—সামান্য দিয়ে দেওয়া সোনার হারের প্রতি যাঁর কখনও কোন লোভই থাকতে পারে না—এ কথা লোকে বুঝতে পারলে না।

মাস ছয়েক এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন এদিকে আসল কালী জাগ্রতা হলেন। মেজ্‌ঠাক্‌মা ছিলেন বড়মার গুপ্তচর। তিনিই একদিন কার কাছে সন্ধান পেয়ে শাশুড়ীকে গিয়ে লাগিয়ে দিলেন, ছোট বউ বাপের বাড়িতে সেই হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে।

আর যায় কোথা! বাড়িতে একেবারে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। বড়মা ছোট্‌ঠাক্‌মার মা-বাপ তুলে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি আরম্ভ করলে। সেই সঙ্গে আমার নিজের ঠাক্‌মাকেও গালাগাল দিতে লাগল। ছোট্‌ঠাক্‌মার দলে রইল বড়্‌ঠাক্‌মা অর্থাৎ আমার নিজের পিতামহী আর ওদিকে বড়মা আর মেজ্‌ঠাক্‌মা।

বড়মা ছোট্‌ঠাক্‌মাকে বলতে লাগল, তোকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

ছোট্‌ঠাক্‌মা বললে, কার বাপের সাধ্যি আমাকে জুতিয়ে বার করে একবার দেখি! আমি আমার স্বামীর ভাত খাই। কোনও ছোটলোকের মেয়ের ভাত খাই না।

ঝগড়ার সময় বড়মার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজ্‌ঠাকুরদা। ছোট্‌ঠাক্‌মার মুখে এই কথা শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার মাকে অপমান করলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব, ওসব ভাদ্দরবউ-টউ মানব না।

একটু দূরেই ছিলেন সেজ্‌ঠাকুরদা তিনি বললেন, মেজদা, ওসব মেয়ে-মানুষের ঝগড়ায় থেকো না, কি দরকার!

মেজ্‌ঠাকুরদা চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ কর্ শুয়োরের বাচ্চা!

সেজো কর্তা বললেন, তোর বাপ শুয়োরের বাচ্চা।

দুই ভাইয়ে খুনোখুনি হয় আর কি! মেজ্‌ঠাকুমা মাঝে প'ড়ে তখনকার মতন হাঙ্গামাটা আর হতে দিলেন না।

এদিকে মেজ্‌ঠাকুমার দুটো ছেলে ছিল ছোট্‌ঠাকুমার ন্যাওটো। তিনি এ বাড়িতে যখন বউ হয়ে এসেছিলেন, তখন তাদের একটার বয়স ছিল পাঁচ আর একটার দুই, সেই থেকে ছোট্‌ঠাকুমাই তাদের মানুষ ক'রে তুলেছিলেন, ছোট মাকেই তারা মা ব'লে জানত। এই ব্যাপারের সময় তাদের একজনের আঠারো-উনিশ বছর বয়স, সে কলেজে পড়ে; আর একজনের একটা পাস দেবার সময় হয়েছে। ছোট মায়ের এই লাঞ্ছনা দেখে তারা দুই ভাইয়ের নিজের বাপ ও ঠাকুমার সঙ্গে লাগিয়ে দিলে বচসা। আমার বাবা ও নিজের কাকাদের তখন বেশ বয়স হয়েছে। বাবার বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, মা তখন কনে-বউ।

মেজ্‌ঠাকুরদা নিজের ছেলেদের ওই রকম ঔদ্ধত্য দেখে তেড়ে এসে তাদের আক্রমণ করলেন। ছোট্‌ঠাকুমা তাদের বাঁচাতে গিয়ে ভাশুরের হাতে দু-চারটে চড়-চাপড়ও খেলেন। বড়মা তারস্বরে চীৎকার ক'রে আমাদের ঠাকুমা ও ছোট্‌ঠাকুমার চোদ্দ পুরুষ তুলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন।

আমার নিজের কাকারা এতক্ষণ নিরপেক্ষই ছিলেন। কিন্তু বড়মা যখন তাঁদের মাকেও যাচ্ছেতাই ক'রে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরাও ক্ষেপে গিয়ে তাঁদের ঠাকুরমাকে বললেন, খবরদার বুড়ী! আমাদের মাকে গালাগালি করলে জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

সে এক বীভৎস কাণ্ড!

যাক, তখনকার মতন হাঙ্গামা থেমে গেল বটে, কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন, আর এক অন্নে থাকবেন না, বিষয় যে যার আলাদা ক'রে নেবেন।

আদালতে দরখাস্ত পেশ করা হ'ল, বিষয় চার সমান ভাগে বিভক্ত ক'রে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে ছোট্‌ঠাকুমাও দরখাস্ত পেশ করলেন যে, তাঁর স্বামী পাগল, স্বামীর বিষয় তিনি তদারক করবেন।

বড় ও সেজো ভাই সাক্ষ্য দিলেন, ছোট্‌বউ যা বলছেন তা সত্য এবং তাঁদের মতে এ ব্যবস্থা ভালই হবে। ছোটকর্তা কিন্তু নির্বিকার।

মেজ্‌ঠাকুরদা মায়ের প্ররোচনায় ছোট্‌ঠাকুমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে এক দরখাস্ত পেশ করলেন। মামলা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এই রকম ব্যাপার চলেছে, এমন সময় আমার বাবা চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে।

দেখতে দেখতে মামলা খুবই প্যাঁচালো হয়ে উঠল। হাঁড়ি সব আলাদা হয়ে গেল। বাড়িতে পুন্যির দল ছিল অগুনতি, তারা কেউ এর দলে, কেউ ওর দলে ভিড়ে পড়ল। নগদ টাকা, সব বউয়ের গয়নাগাঁটি তখনও বাড়ির গিন্নীর কবলে। মেজ্‌ঠাকুরদার উকিলরা এসে গিন্নীর সঙ্গেই পরামর্শ করে। মেজো কর্তার দুই ছেলে তাদের নিজেদের বাপ-ঠাকুমা ছেড়ে তাদের বড়মা, সেজোমা ও ছোটমার—অর্থাৎ আমার ঠাকুমা, ছোট্‌ঠাকুমা ও সেজ্‌ঠাকুমার দলে, সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া-শোওয়া।

এই রকম জমজমাট ব্যাপার চলেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় কোথা থেকে ছোট্‌ঠাকুমার বাবা এসে হাজির হলেন। কি ব্যাপার! কথায় বার্তায় জানতে পারা গেল, এই হারগাছার জন্যে তাঁর বেয়ান যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তাই তিনি সেটা নিজে নিয়ে এসেছেন ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

বড়মাকে হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি এ বাড়িতে জলগ্রহণ না ক'রে ধূলো-পায়েই বিদেয় নিলেন। যাবার আগে ছোট্‌ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর কি কথা হ'ল, তা এ বাড়ির কেউ জানে না।

এদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরের অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিন দুই থেকে ফিরে গেলেন নিজের দেশে, যাবার আগে মেয়ের সঙ্গে একবার দেখাও করলেন না।

এই ব্যাপারের বোধ হয় দিন তিনেক বাদে একদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল, ছোট্‌ঠাকুমা বাড়িতে নেই। তিনি দুখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। একখানা তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার পিতামহীকে আর একখানা তাঁর স্বামীকে।

স্বামীকে লিখেছিলেন, আমাকে এমন অপমান করবার যদি ইচ্ছা ছিল তো

আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার মতন অপদার্থকে আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করি না, আমি তোমাকে ত্যাগ করলুম।

আমার ঠাকুমাকে লিখেছিলেন, তোমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। এ বাড়ির মধ্যে তোমাদের স্নেহ-ভালবাসাই আমার মনে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার দুই ছেলে, নরেন আর সুরেন—অর্থাৎ আমার মেজ ঠাকুরদার দুই ছেলে—তাদের তোমরা দেখো, এই আমার শেষ অনুরোধ। আমাকে ভালবাসে ব'লে তাদের অশেষ দুর্গতি হ'ল। তোমরা দুজনে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমার বউমা—অর্থাৎ আমার মা—তাকে আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, সে সুখী হবে। আমার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। আমার খোঁজ ক'রো না। কারণ, তোমাদের মতন ছোটলোকের ঘরে আমি আর পদার্পণ করব না।

দিদিমণি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার ছোট্‌ঠাকুমার যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁর পনেরো বছর বয়েস ছিল, আর যখন তিনি চ'লে গেলেন তখন তাঁর বয়েস ছত্রিশ। এই একুশ বছর একাধারে স্বামীর অবহেলা ও শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে শেষকালে অসহ্য হওয়ায় অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সে সে সৌন্দর্যের ওপর ভরসা ক'রে কুলত্যাগ করা চলে না। একুশ বছর ধ'রে প্রতিদিনের সঞ্চিত অভিমানের সেই দীর্ঘশ্বাস, সতীলক্ষ্মীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাতে দেখতে দেখতে এই বিরাট পরিবার পাত হয়ে গেল।

ছোট্‌ঠাকুমার সেই চিঠি প'ড়ে আমার ঠাকুরমা একেবারে বিছানা নিলেন। ঠাকুরদা তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, তুমি কেন অমন করছ! তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, মেয়েমানুষ সে, যাবে কোথায়? আমি তাকে ঠিক ধ'রে আনব।

আমার দুই কাকা—মেজ ঠাকুরদার দুই ছেলে—তারা ছিল ছোটমা-অন্ত-প্রাণ। তারা প্রতিজ্ঞা করলে, ছোটমাকে যদি কোন দিন পাই তো ঘরে ফিরব, না হ'লে এই শেষ যাত্রা ব'লে তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তাদের বড়-মা, অর্থাৎ আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, আজও তারা বাড়ি ফেরে নি।

আমার বড়মা বললেন, যে মাগী নিজের ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হতে পারে, সে যে কুলত্যাগ করবে তার আর বড় কথা কি!

তারপরে পনেরো বছরের মধ্যে এই সংসার দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল। বাড়িতে প্লেগ আসবার আগে বাড়িময় যেমন এখানে ওখানে মরা ইঁদুর প'ড়ে থাকতে দেখা যায়, ঠিক তেমনই ভাবে এঘরে ওঘরে লোক মরতে লাগল।

আমার ঠাকুমা ছোট্‌ঠাকুমার সেই চিঠিখানাতে প্রতিরাত্রে একটা ক'রে সিঁদুরের টিপ দিয়ে নমস্কার ক'রে তবে শুতে যেতেন। তিনি মারা যাবার সময় চিঠিখানা আমার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাও তাঁর শাশুড়ীর মতন রোজ সন্ধ্যার সময় সেটাতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে পূজো করতেন। আমরা সে চিঠি দেখেছি, কিন্তু সিঁদুরের ছাপে ছাপে তার অক্ষরগুলো এমনই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে, তার কিছুই পড়তে পারা যেত না।

মা যখন মারা যান, তখন আমি শ্বশুরবাড়িতে। মাথার সিঁদুর খুইয়ে বাড়িতে এসে অবধি আর সেখানা দেখতে পাচ্ছি না।

এই অবধি ব'লে দিদিমণি চুপ করলে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

সংসারের সং

আমি তো মশাই, প্রায় পাগল হয়ে এলুম—ঝি, চাকর আর বামুন নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট প্রতিদিন পোয়াতে হচ্ছে, তা যদি আপনাদের হ'ত, তা হ'লে আপনারা এদ্দিনে হয় কাশী কিংবা কাশ্মীরে গিয়ে ব'সে থাকতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এঁরা তো সবাই মিলিটারিতে চ'লে গিয়েছিলেন, তখন তো এঁদের টিকি দেখা যায় নি, তারপর যখন ফিরে এলেন তখন থেকে যে ঘর বাড়িয়েছেন, তাতে তো সংসারে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছে দেখছি।

ঝি, চাকর, বামুন একটা-না-একটা প্রায় সব বাড়িতেই দরকার হয়, আমাদের আবার একান্নবর্তী পরিবারে যেখানে একশো একান্ন জন থাকেন তাঁদের তো এই জীবগুলি না থাকলেই অচল; কিন্তু এঁদের ঠেলায় যে আমার জিব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। ওঃ! ঝি চাকর বামুন নিয়ে যে এত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, তা কস্মিনকালেও কখনও ভাবতে পারি নি—এদের সমস্যা কৃষক-প্রজা-মজুর রাজের চেয়েও কঠিন।

আপনারা হয়তো বলবেন, তোমার ঝি চাকর বামুন রাখা কেন? অত বাবুয়ানির

দরকার কি? আমিও তো তাই বলি, তা গিন্নীদের সব এই কথাটা বোঝাতে পারেন কি? নেহাৎ দায়ে না পড়লে এই বাজারে বাড়িতে কেউ সদাব্রত খোলে?

আমার তো বাড়িতে মেয়েদের অভিযোগ শুনে শুনে কান প'চে গেল—আর কত হাঁড়ি ঠেলব? সবাই বামুন পাচ্ছে আর তুমি পাও না? দেখুন দেখি, আজকাল কি চট ক'রে এসব পাওয়া যায়? তার ওপর আবার আমার বাড়ি—এমনই একটা বামুন আনলে চলবে না, সে সত্যি বামুন কি না খোঁজ নাও, গায়ত্রীর মন্তর মুখস্থ আছে কি না দেখ, ইত্যাদি হাজার বায়নাক্কা।

আচ্ছা, আমি সত্যি-মিথ্যে যাচাই করি কোথায় বলুন তো? কলকাতা শহরের বামুন, সে হয়তো আগে নাপিতের ব্যবসা করত, তারপর বামুনের চাহিদা দেখে হয়তো বাজার থেকে ছ পয়সার পৈতে কিনে উল্টো দিকেই গলায় লাগিয়ে ঘুরছে, আমি তার সঠিক খোঁজ নিই কি ক'রে? আমার নিজের অত বায়নাক্কা নেই। যে রাঁধতে পারে সে-ই বামুন, কিন্তু আমার বাড়ির ধরনই আলাদা। সতেরো জায়গায় খোঁজ নিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে তাঁকে আমার গুষ্টির রান্না করতে দেওয়া হবে।

তেমনই জোগাড়ও হয়ও। এক বছর খোঁজাখুঁজির পর হয়তো একটি ভরদ্বাজ গোত্তর মিলল—তেমনই তাঁর বায়নাক্কা! আঠারো টাকা মাইনে, বছরে ছখানা কাপড়, তিনখানা গামছা, এক জোড়া জুতো, রোজ জলখাবারের চারটে ক'রে পয়সা, আধপো সরষের তেল, সকাল বিকেল চা, কাপড়-কাচা সাবান, নস্য, ধোপার পয়সা ইত্যাদি। দয়া ক'রে ফুলেল তেল আর দামী এসেন্স-সাবানটা এখনও চাইতে শুরু করে নি এই যা রক্ষে! মানে তাঁর যা দাবি তা একেবারে জামাইষষ্ঠীর ফর্দ! বাপ রে বাপ!—এই ক'রে ঠাকুর এলেন।

সরস্বতী-ঠাকুর এলে ছেলেরা যে ভাবে যত্ন করে, তার চেয়ে বেশি আদর ক'রে এঁকে রাখতে হবে। সকাল আটটার আগে তিনি রান্নাঘরে পদার্পণ করবেন না, রেশনের কমবেশি-করা মাল তাঁর হাতে আর্ধেক ঘাল হবে, বেলা বারোটার সময় তিনি নিজের ভাত বেড়ে খেয়ে-দেয়ে বাসায় চ'লে যাবেন, আবার সন্ধ্যে সাতটার আগে তিনি দেখা দেবেন না, যা রাঁধবেন তা তিনি ছাড়া কারুর মুখে দেবার জো থাকবে না, মেয়েরা সেই সমান রান্নাঘরে থাকবেন আর ব'কে ব'কে মাথা গরম করবেন, ঠাকুর শুধু উপকারের মধ্যে হাঁড়িটি উনুনে ওঠানো নামানো এবং মেয়েদের পরিচালনায় রান্নার মসলা তরকারিতে দিয়ে নিজের খুশিমত একটু হাতাখুন্তি নেড়ে চ'লে যাবেন—এই কাজ। হেঁসেল ছোঁবার জো নেই, তা হলেই তাঁর খাওয়া মাটি! তবু মেয়েরা বলবেন না যে, ঠাকুরের আর দরকার নেই, আমরাই বেঁধে-বেড়ে নোব।

অথচ মাসের মধ্যে ছ দিন তাঁর জ্বর, ন-দিন তাঁর পেটের অসুখের কামাই লেগেই

আছে। বকবার জো নেই, তা হ'লেই তো চলল। বড় বড় মেজাজওয়ালা বাবুদের দেখছি, কাহিল হয়ে এসেছেন। কারণ, পাচ্ছেন কোথায়?

তার ওপর আপনাদের জ্বালায় তো লোক রাখবারও উপায় নেই। আমার সাতরাজার ধন মানিকটিকে যদি আপনারা পঞ্চাশ দফা পঁচিশ টাকা মাইনে দোব, ভাল লাঞ্চ দোব, ডিনার দোব ব'লে রোজ আড়ালে লোভ দেখান, তা হ'লে আমার কাছে সে থাকেই বা কি ক'রে? আপনারাই তো দফা খেলেন! আপনাদের ঈশ্বরের কৃপায় যুদ্ধের বাজারে বুদ্ধির জোরে দু-পয়সা হয়েছে ব'লে শুধু শুধু গরিবের সংসারে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে কি লাভটা হচ্ছে বলতে পারেন?

যাক, বামুনের পর্ব গেল, এল চাকর—বেতন বারো টাকা, তা ছাড়া আর সব তো আছেই। তিন বালতি জল তুলতে তিনি হাঁপাবেন, সারাদুপুর ঘুমুবেন, বাজার করার সময় বাবু সঙ্গে গেলে সারাদিন গোসাভরে ব'সে থাকবেন, যেখান থেকে যা মালপত্তর কিনে আনবেন তা যত দামেরই হোক তার ওপর কথা বলার কারুর কন্ট্রোল থাকবে না, সেইটেই ধ্রুব-সত্য ব'লে মানতে হবে, রাত্তিরে সদর-দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাবেন এবং চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও তিনি দায়ী থাকবেন না, জিনিসপত্র যথাযথ স্থানে আস্ত থাকে সেটা বরদাস্ত করবেন না, সন্ধ্যে থেকে ঘুমুবেন, দুপুরেও তাই, বকলে তক্ষুনি মাইনে-পত্তর নিয়ে চ'লে যাবেন এবং যে কদিন দয়া ক'রে থাকবেন, সে কদিন এত স্বল্প আহার করবেন যে স্বয়ং সরকার সে ব্যবস্থা না করাতে আমাকে তার বন্দোবস্ত করবার জন্যে দু-চারজন সৎ-ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হতে হবে।

দিব্যি আছি। এর পর আছেন দুটি রাতদিনের ঝি—একটি মেজোবাবুর আর একটি সেজোবাবুর, তাঁদের চীৎকারে আর বউমাদের প্রতিবাদে বাড়িতে একমুহূর্ত যদি টিকতে পারেন! শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য-আইন থাকলেও, মনে করুন, মাঝে মাঝে সদলবলে সামনের রকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এর ওপর যখন আবার গিন্নী সালিশী করতে নামেন, তখন মনে হয় যে, অ্যাটম-বম না ফেললে এ ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

মশাই, নীচে একটা বড় তক্তাপোশে শোবার জায়গা ক'রে দিয়েছি, রাত দেড়টার সময় হৈ-হৈ কাণ্ড! কি, ব্যাপার কি?—না মেজোবাবুর ঝি পদী, সেজোবাবুর ঝি ক্ষুদীকে ঘুমের ঘোরে ল্যাং মেরেছে। তার ফলে ক্ষুদী খেপে গিয়ে দুমদুম ক'রে তার পায়ে দুটো কিল বসিয়ে দিয়েছে, পদী চীৎকার শুরু করেছে। তখুনি উভয়ের মনিব নীচে নেমে ঝিয়েদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু ক'রে দিয়েছেন, ঘুমের দফা গয়া, আমি গিয়েও কাউকে থামাতে পারি না, সে এক বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

ইনি বলেন, আমার ঝিয়ের একটা আলাদা ঘর দাও। উনি বলেন, ওঁরও আলাদা

ব্যবস্থা করা চাই। এর কি উপায় করি বলুন তো? এঁদের এক একটা ঘর দিতে হ'লে তো আমায় নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ছাতে ম্যারাপ বেঁধে শুয়ে থাকতে হয়, তা না হ'লে এ বাজারে বোধ হয় ঝি-চাকর রাখা অসম্ভব।

নিরুপায় হয়ে শেষে তক্তাপোশে একটা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে ব'লে দিলুম, অত ঝগড়াঝাঁটির দরকার নেই; কেউ এই সীমানার বাইরে ঠ্যাং সরাবে না।

তাতেও কি ঝঞ্ঝাটের রেহাই আছে? পরশু রাত দুটোর সময় আমার দরজায় দমাদ্দম আওয়াজ। ধড়মড় ক'রে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আওয়াজ এল পদীর।

গিন্নী উঠে বাইরে গেলেন, পদী তাঁকে ডাকছে নীচে। কারণ?—ক্ষুদী নাকি খড়ির দাগ পেরিয়ে আড়াই হাত বেঁকে পদীর বর্ডার-লাইন ক্রস ক'রে গেছে। সে চীৎকার ক'রে বলছে, বড়মা, তুমি দেখবে এস ক্ষুদীর কাণ্ড! বাবু যা দাগ দিয়ে গেছে তার থেকে কোথায় স'রে এসেছে, দেখবে এস। আমি যদি এখুনি মারি, তা হ'লে আমায় দুষ? ক'রো না বাপু, তুমি একবার বাবুকে ডাক, নিজে এসে তিনি লাইন দেখে যান।

গিন্নী ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলেন, বকিস নি। বাবু এখন ঝিয়েদের শোয়া দেখতে যাবে? দূর হ! কাল সকালে সে আমি দেখব'খন।

পদী রাগতভাবে দুমদুম পদবিক্ষেপে প্রস্থান করলে গিন্নীর সব তাল এসে পড়ল আমার ওপর, তোমার যেমন আক্কেল, কোথাও কিছু নেই, উনি খড়ি দিয়ে দাগ কেটে এলেন, একটা যদি কিছু গোছ-বন্দোবস্ত থাকে! চিরটা কাল হাড় জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।

আচ্ছা, আমি কি করব বলতে পারেন? ঝি-চাকর নিজের নিজের জায়গায় শুয়ে আছে, তারা যদি লাথালাথি শুরু করে, তা হ'লে কি সেটাও আমায় দেখতে হবে? তা হ'লে তো আপিস থেকে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এদের সব ঠ্যাং ধ'রে ব'সে থাকতে হয়! কি আপদ বুঝুন!

এদের খাওয়া পছন্দ নয়, কাজ পছন্দ নয়, শোওয়া পছন্দ নয়, মাইনে পছন্দ নয়—এদের যে কি হ'লে সব-কিছু পছন্দ হয় তা তো বুঝে উঠতে পারি না।

আপিসে কর্তাদের এত ভাল বন্দোবস্ত ক'রে আমাদের মত কেরানীদের রাখতে হ'লে বোধ হয় আপিস তুলে দিতেন, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে এবং লোকজনকে নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট আমায় পোয়াতে হচ্ছে, তাতে আমায় না পটল তুলতে হয়, তাই ভাবছি।

"শ্রীবিরূপাক্ষ"

পঞ্চকন্যা

না, আমি পুরাণখ্যাতা চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি। এ পঞ্চকন্যা আমাদের মধ্যেই বিরাজমানা। ঘরে ঘরে। বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার মিষ্টার জগদীশ রায়ের বিশাল একতলা বাড়ির পাশের ছোট টালির বাংলোখানা আমার। আমি থাকি সেখানে দুটি কুকুর, একটি দারোয়ান এবং পুরাতন আমাকে নিয়ে। আমার পেশা? সাহিত্য। হ্যাঁ, আজকাল এ দেশেও বিদেশের নজিরে মেয়েরা সাহিত্যকে পেশা ব'লে গ্রহণ করেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার কথা বেশি বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ আমার গল্পের নায়িকা আমি নই, জগদীশ রায়ের একমাত্র মেয়ে সুলেখা ও সুলেখার চার বান্ধবী। মিষ্টার রায় এবং আমার বাংলোর মাঝখানে একটা প্রাচীর আছে, তার গায়ে কালচে-সবুজ শ্যাওলার আস্তর, তার মাথায় মাধবীলতার গোলাপী-সাদা রঙের মেলা। সেই প্রাচীরের গায়ে সুলেখার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড চালু বারান্দা, বেতের আসবাবে সাজানো। সুলেখার পার্লার। গ্রীষ্মকালে, বিশেষত চাঁদিনী রাত্রে, সুলেখা অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানে বন্ধুদের নিয়ে গল্প করে। তাদের উচ্চ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই, তাদের কথা আমি বুঝি। ওই প্রাচীরের পাশেই আমারও বসবার পোর্টিকো, লতাজালে ঢাকা। চারপাশে অজস্র পুষ্পিত গাছের বাক্স সাজানো। সেই কুঞ্জবনের আড়ালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বসি নিঃশব্দে, হাতে কোন সেলাইয়ের কাজ নিয়ে। প্রবাসী ভ্রাতাদের জন্য নানা উলে জাম্পার বুনি প্রতীক্ষারতা পীনেলোপীর ধৈর্যে। কান থাকে সুলেখা রায়ের বারান্দায়। দোষ মনে করি না। আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী তারা। সুতরাং আমিও বন্ধু।

সুলেখা রায় যেন একটি মহাসাগরের তীর, সেখানে কত যাত্রী আসে, কত জাহাজ নোঙর ফেলে। আবার তারা চ'লে যায়, নূতন দল দেখা দেয়! সে যেন নিজেই ওই ছায়াময় কাননকুন্তলা বাড়িটির সত্তা। কত পাখি বসে, গান গেয়ে যায়। পুরুষদের কথা কিছু বলতে চাই না, কারণ বহুদিন ধ'রে পুরুষ অশ্রান্তভাবে নিজেদের কথা ব'লে ব'লে লাইব্রেরি ভরিয়েছে। তাদের সে ক্ষমতা আছে। মেয়েদের কথাই এখন বলা দরকার। আমি তাই সুলেখার মেয়ে-বন্ধুদের কথাই বলব। যারা তার বিশেষ বন্ধু তাদেরই কথা। তারা চারজন ও সুলেখা রায় আমার এই বক্তব্য কাহিনীর পঞ্চকন্যা।

নীল আকাশের ইন্দ্রনীলের সেটিং-এ শুভ্র মুক্তার থালার মোনা চাঁদ। আধুনিক রুচি একটি। রায়-বাংলোর তৃণে মরকত, বৃক্ষের গোলাপে চুনি। এক পার্শ্বে ছোট পণ্ডের জল মুক্তার দ্যুতির পাশে হীরক-দীপ্তি ধরেছে। মালী মোরার বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে। অস্থির বাতাস মাধবীর দল ঝরিয়ে ফেলছে। পঞ্চকন্যার পশ্চাৎপটে অসংখ্য

সীজন্ ফ্লাওয়ার। আমার বাক্সে বোনা রজনীগন্ধা আর গোলাপী কার্নেশন সুবাস-বিহ্বল ক'রে তুলেছে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা। সুলেখার বাগানে চাঁদ, আমার পোর্টিকোতে অন্ধকার লতার চাঁদোয়ার তলায়। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ব'সে প্রতিটি কথা আমি শুন্‌ছি তাদের, হাতে রয়েছে মস্ত বড়ের উল হাতির দাঁতের কাঁটায় গাঁথা। মনে হচ্ছে, নির্লিপ্ত শান্ত ভঙ্গীতে আমি অবসর যাপন করছি নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেলাই হাতে। কিন্তু সেলাই আমার ভান মাত্র, ওদের কথা এমনই চুরি ক'রে শোনা আমার নেশা।

পঙ্ককন্যা অবিবাহিতা। কেন যে, এ কৌতূহল মনে জেগেছে বহুবার। কিছু কিছু কথাও শুনেছি। সম্পূর্ণ কাহিনী আজ উপহার দেব। জানি, আজ এই মদির বাতাসে, দিবা ও রাত্রির এই মিলনের শুভক্ষণে তারা মন খুলবে।

নিত্যকার মত দারোয়ান হাতের কাছে বাদামের শরবত ও বিকালের ডাক রেখে গেল। ব্যাঙ্কের শেয়ারে এবার কত ডিভিডেণ্ট পাওয়া যাবে জানবার কৌতূহল নেই এখন। আমার পঙ্ককন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তারা সমবয়স্কা, চব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে।

গৃহের অধিবাসিনী সুলেখা স্বনামধন্য পিতার আদরিণী কন্যা। বি. এ. পড়া পর্যন্ত কলেজে সময় কাটিয়ে অসুস্থ শরীরের অজুহাতে পরীক্ষা দেয় নি। এই নিদারুণ গরমেও বেতের ঈজিচেয়ারের হাতল ও তার পায়ের ওপর দিয়ে একখানা সূক্ষ্ম রেশমের নীলাভ চাদর ঢাকা রয়েছে। পীড়া তার বাতব্যাধি। প্রকৃতির জহরতকে ম্লান করে দিয়ে তার দীর্ঘাকার আঙুলগুলিতে একটির পর একটি হীরা চাঁদের আলোয় জ্ব'লে উঠছে।

সুলেখার পাশে বেতের সোফায় অর্ধশায়িতা কুমারী মাধবী নন্দী। সুগায়িকা ও কবি। দরিদ্র মাতাপিতার ষষ্ঠ সন্তান।

সুলেখার অন্য পাশের চেয়ারে কুমারী রমলা বসু, বিদেশী শিক্ষার ছাপ-মারা। অত্যাধুনিক পরিবারের অত্যাধুনিকা কন্যা।

রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে কুমারী অচলা মজুমদার। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

আরও একটু ওপাশে বসেছে কুমারী বকুল সোম। গুণের তালিকা তার দীর্ঘ নয়। কিন্তু নির্মল চাঁদের আলোয় সে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। বকুল অপরূপ সুন্দরী।

রমলা বসু হঠাৎ স্বভাবোচিত উচ্চ হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল, আচ্ছা সুলেখা, আমরা একটা চিরকুমারী সভা খুলি না কেন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে?

সুলেখা ধীরে ধীরে একটু ন'ড়ে ব'সে অভ্যস্ত বক্রহাস্যে তার অভিজাতসুলভ মার্জিত নীচু সুরে উত্তর দিলে, সভ্য কিন্তু পাব না। নিজেদের নিয়ে মেতে থাকতে হবে।

অচলা মজুমদার কালো ফ্রেমের চশমায় ঝিলিক হেনে যোগ দিলে, রাইটো।

আমাদের আর বাইরের সভ্য দিয়ে কি দরকার? আমরা নিজেরা নিজেতেই সম্পূর্ণ। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব এতদিন টিকে আছে, সভাও টিকে যাবে।

বকুল সোম মলিন মুখে বললে, আচ্ছা, একটা অদ্ভুত কথা কি কখনও তোমাদের মনে হয় না? আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?

হচ্ছেনা অ্যাট অল। ঠিক ধরেছ তুমি বকুল। অথচ অন্য মেয়েদের চেয়ে, অর্থাৎ যাদের রোজ রোজ বিয়ে হচ্ছে, তাদের চেয়ে আমরা কিছু মন্দ নয়।—অচলা মজুমদার সায় দিলে।

রমলা বসু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল,—আহাঃ অচলা, বল না কেন আমরা অনেক ভাল। গুণ আছে আমাদের সকলের। রূপ? হ্যাঁ, সবাই বকুল না হ'লেও কেউই শূর্পণখা নই।

মাধবী নন্দী চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে,—আমার অবস্থা খারাপ হ'লেও তোমাদের সকলের টাকাকড়ি আছে। টাকার অভাবে বিয়ে না হওয়ারও কারণ নেই।

আর আমাদের চরিত্র,—অলস ভঙ্গীতে সুলেখা রায় উঠে বসল,—হ্যাঁ, chaste as Diana না হ'লেও আমরা চরিত্রশালিনী। অন্তত, আমার চরিত্র যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে চরিত্র হারাবার অবকাশ হ'ল না!

আমাদের স্বভাব-ব্যবহারও ভাল। কেউ আমাদের নিন্দা করে না। লোকে আমাদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। আমরা হাসিখুশি, আমরা চমৎকার মেয়ে!—বকুল আবার আশ্চর্য হ'ল।

এদিকে স্বাস্থ্যও আমাদের ভাল। এক সুলেখার শৌখিন অসুখ ছাড়া সকলেই অত্যন্ত সুস্থ। না সুলেখা, I must be frank। তোমার অসুখ মানসিক বিলাস, যেমন ভিয়েনাতে আমার কলেজ-বন্ধু অলগার ছিল।—রমলা বসু অকারণে রেলিঙের জড়ানো গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ দ্বিখণ্ড ক'রে ফেললে।

Oh yes, come on Sulekha, be a sport. স্বীকার কর কাজের অভাবে অসুখ তোমার অকাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—নখর-রমণীয় হাতের কররেখা জ্যোৎস্নায় ধ'রে অচলা মজুমদার বললে, নাঃ, আমার হাতে বিয়ে নেই।

বকুল সোম ব্যথিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, বিয়ে আমি করতে চাই। মাঝে মাঝে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। আর, তোমরা কেউ বিয়ে-পাগলা না হ'লেও একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বস নি। আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?

অথবা আমরা বিয়ে করছি না কেন?—সুলেখা সংশোধন করলে।

চাঁদের ওপর একখানা হাল্কা মেঘ শৌখিন আঁচলের মত বিছিয়ে গেল। চাঁদের ব্রুচে কোন বিলাসিনীর শাড়ি বিদ্ধ হ'ল যেন। চাঁদের আলোয় সুলেখার বাগানের

মুড়ির পথ, লাইলাক ঝোপের তলার মাটি কটকী রূপোর কাজের মত ঝকমক ক'রে উঠল। হাস্নু-হানার গন্ধে এসে মিশল সোনায়-গড়া দেশী চাঁপার তুলনাহীন সুবাস। আবার দক্ষিণের ব্যাকুল বাতাস ব'য়ে গেল ঝাউগাছের জালী-কাটা পাতার গুচ্ছে দোলা দিয়ে। প্যান্সি, জিনিয়ার বেডের পাশে লম্বা সবুজ ফড়িং লাফাতে লাগল। পঞ্চকন্যা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকে একবার মনে মনে বললে, এমন কেন হয়!

ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের কথা পরস্পরের কাছে মন খুলে বলতে লাগল। সেই সব কথা আমিও বলব।

রমলা বসু। এই যে চঞ্চলা লাবণ্যময়ী তরুণী, কে জানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে এর প্রেম-জীবন শেষ হয়ে গেছে। রমলা মণীন্দ্র তালুকদারের বাগ্‌দত্তা ছিল, মণীন্দ্র গেল বিদেশে। ফিরে এল মণীন্দ্র জার্মান নারী সঙ্গে করে। সেই বছরই রমলা বসু সাগর পার হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

বহু পুরুষের কামনা-কুটিল বাহু রমলা বসুর ক্ষীণ কটি-বেষ্টন করেছে। বহু পুরুষের রুক্ষ অধর তার নরম অধরকে লাঞ্ছনা করেছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বিবাহ রমলা করতে পারছে কই? যখন নিরালা রাত্রে নয়নে নিদ্রা আসে না, রমলা ঊর্ধ্বে নেটের মশারির কারুকার্যখচিত চালের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ব'লে ওঠে, মণি, তোমাকে ভুলতে পারি না কেন?

অচলার ও বালাই নেই। ছেলেবেলা থেকে পরীক্ষার ফল ভাল করবার দুরূহ প্রয়াসে অন্য দিকে মাথা তার যায় নি। একেবারে অধ্যাপিকা হয়ে ব'সে অচলা বিবাহের কথা ভাববার সময় পেল। কিন্তু বাধা দেখলে অনেক। সে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে রোজগার করছে, সে সব কটা পাস ক'রে কলেজে পড়ায়। সুতরাং অভিভাবকেরা তাকে তাঁদের তথাকথিত সুকুমারমতি তরুণবয়স্ক স্নেহাস্পদ, যারা সাতঘাটের জল খেয়ে চল্লিশ বছরেও কুমার নাম ঘুচোয় নি, তাদের অনুপযুক্তা মনে করেন। অচলার প্রকৃত বয়স ছাব্বিশ শুনে স্থির করেন আসলে ছত্রিশ।

পাত্রদের মতও তাই। চশমা-চোখো টিচারনী চায় না তারা। তারা চায় অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকা। কর্মভীরু এবং সুবিধাবাদীর দল চায় অচলাকে রোজগারের যন্ত্র হিসাবে, কিন্তু অচলা চায় না তাদের। ক্ষোভের সঙ্গে একদিন অচলা বলেছিল আমি শুনেছি, জানো, শৈলেন দেব বিয়ে করতে চায় আমাকে। শৈলেন দেব দুবারের বার বি. এ. পাস করেছে। সে বন্ধুদের ব'লে বেড়াচ্ছে, বিয়ে তো আমি ভাই অচলা মজুমদারকে বিনা কারণে করতে চাচ্ছি না, জমিদারি কিনতে চাচ্ছি।

বকুলের অবস্থা আরও সঙ্গিন। রূপ দেখে তাকে পুরুষ লুব্ধ পতঙ্গের মত বেষ্টন

ক'রে ধরে। বিয়ে খুব কম লোক করতে চায়। তার কারণ বকুল সোম নাচগান জানে না, আধুনিক শিক্ষার অভাবে পুরুষমহলে সে জড়পদার্থ ব'নে যায়। তাকে স্পর্শ ক'রে সুখ আছে, তার সঙ্গে কথায় সুখ কই? ক্ষণভুঞ্জন উৎসবে তার কোমল দেহ বক্ষে নিপীড়ন ক'রে ধর, তার পল্লব-মসৃণ অধরে জ্বালাময় প্রবাহ এনে দাও। কিন্তু বিবাহ? ওই লাজুক কুনো মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো? অসম্ভব।

বৃদ্ধেরা অবশ্য তরুণীভার্যারূপে বকুল সোমকে কামনা করে, কিন্তু বিদ্যুৎবহ্নির মত নিজের রূপকে বকুল বৃদ্ধের উপভোগ-বস্তু ক'রে দিতে চায় না। বিশেষ শ্রেণীর যুবকেরা আসে লুব্ধ হয়ে, বিবাহ-প্রস্তাবও দু-একজন করে। কিন্তু তাদের লম্পট-দৃষ্টি নাকি বকুলের দেহে উষ্ণ সলিল সিঞ্চন করে। দুঃখের জীবন বকুল সোমের।

তারপর সুলেখা। এই রহস্যময়ী ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি নিজের দোষে এবং নিজের ইচ্ছায় আজও কুমারী। দেহে তার রোগ আছে। বিদ্যা বা গুণ বাহুল্য নেই তার। দেখতে সে ভাল নয়। তবু তার যা আছে, বন্ধুদের কারও নেই তা। তার আছে ব্যক্তিত্ব।

কাউকে পছন্দ হয় না সুলেখা রায়ের। পুরুষকে সে খেলার সামগ্রী মনে করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে খেলায় অরুচি হ'লে দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু বেউল তার খালি থাকে না, নব পূজারী আসে।

পুরুষের ক্ষৌরিত কঠিন গণ্ড তার কথার বাণে কেমন রক্তাভা ধরে, পুরুষের সবল মন তার হাসির ছোঁয়ায় কেমন ক'রে কাঁপে—সেই দেখা, সেই খেলা সুলেখার নেশা। নেশাখোর মেয়ের বিয়ে হওয়া দায়।

এদের মধ্যে মাধবী নন্দী কিছু পরিমাণে স্থৈর্য লাভ করেছে। বিয়ে তার ঠিক হয়ে আছে পাড়ারই ছেলের সঙ্গে। সে ছেলে ভাল চাকরি পেয়ে কিছু টাকা জমাতে পারলেই বিয়ে হবে। তার আগে মাধবী রাজি নয়। অভাবে বর্ধিত হয়ে মাধবীর অভাবকে বড় ভয়। মাধবীর মনের মানুষ তার দ্বারে আসে পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে চ'ড়ে। মাধবীর প্রেমে আর মাধবীর আদর্শে মিল হয় নি। তাই দুঃখ মাধবীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। রাত্রে যখন প্রিয়-বাহু-বল্লরী তাকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে অতি কাছে টেনে নেবে, তখন মলিন শয্যা মেঝেতে বিছিয়ে সূতিকাগ্রস্তা জননীর পাশে শুতে হয়। যখন ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে আকুল ক'রে তোলে, তখন চাঁদের দিকে চেয়ে গান গাওয়া বা খাতা-পেন্সিলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ভিন্ন মাধবীর আটাশ বছরের জীবনে কিছুই করবার থাকে না। কবিমন মাধবীর। তার প্রয়োজন একটি প্রেমিককে, যার গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী হবে, যার রক্তধারায় সে সন্তান রচনা করবে।

সুলেখার বাগানের ঝাউগাছে একটানা সুরে পাখি গান গেয়ে উঠল। ছোট ছোট

মেঘ সেই পাখির ঝাঁকের মতই আকাশ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল। আকাশের পাখি তারা। বাগানের পাখি তাই ডাকছে তাদের নীচে নেমে ধরিত্রীকে শ্যামল ক'রে দিতে। লিলি অব দি ভ্যালির পরাগে হলুদ-কালো প্রজাপতি এসে বসল। পদ্মের জলে একটা নীল স্যাপড্রাগন ফুল খ'সে প'ড়ে ভাসতে লাগল। চাঁদ আরও মাথার ওপরে উঠেছে।

আমার আয়া এসে জানালে, রাত্রির খাবার দেওয়া হয়েছে। আজকের মত শেষ হ'ল আমার পঞ্চকন্যার কাহিনী। উল-কাঁটা পাশের টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আমার পোর্টিকোর পল্লব-প্রাচীর পার হয়ে চাঁদের আলো এসেছে। সে আলো আমার কালো চুলে বাঁকা হয়ে পড়ল।

পঞ্চকন্যা সহসা চুপ ক'রে গেল। তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। ভয় পেয়েছে তারা। চোখ নীচু ক'রে হীরক-শোভিত সরু আঙুল দিয়ে সুলেখা চুল ঠিক করতে লাগল। তার হাতের হীরকখণ্ডগুলো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে জ্ব'লে উঠল আমাকে যেন সাবধান করতে,—সাবধান! তুমি কি আমাদের কথা শুনেছ?

সুলেখার আধুনিক সত্তা জানে না, বন্ধুত্ব কেবল ব্যবহারিক জগতের নৈকট্যে হয় না, বন্ধুত্ব হয় হৃদয়ে। আমি তাই তাদের বন্ধু। তাই আমার বন্ধুর মন আজ তাদের ব'লে দিতে চায়: হায় আধুনিকী! তোমরা ভুলে যাও তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি, আদর্শবাদ। ভাবপ্রবণতা তোমাদের সুখী করবে, মূঢ় ভালবাসা পথ দেখাবে। নির্বিকার নারীত্বে তোমাদের মুক্তি। জনারণ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের মানুষকে কি চিনে বার করা যায়? মনের মানুষ চিরদিন মনেই থাকে। সমস্যা তোমাদের জটিল। বিবাহ ও প্রেম এক নয়। সেকালের মন নিয়ে হয়তো অজ্ঞান হবে, কিন্তু অসুখী তো হবে না!

শ্রীমতী বাণী রায়

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় আজ স্বর্গগতা; তাঁহাকে লিখিত শরৎচন্দ্রের চারিখানি পত্র মুদ্রিত হইল। লীলা দেবীর পুত্রবধূ শ্রীমতী মিনতি গঙ্গোপাধ্যায় পত্রগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[লীলা দেবীকে লিখিত]

বাজে শিবপুর ২৪।৭।১৯ (হাওড়া)

পরম কল্যাণীয়াসু,— আপনার পত্র এবং 'মিলন' আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার বই যে আপনার ভাল লাগে ইহার চেয়ে গ্রন্থকারের বড় পুরস্কার আর কি আছে।

আপনি ভক্তির দাবী জানাইয়াছেন। ভক্তি যেখানে শুধু বিনয় নয়, সত্যকার বস্তু, সেখানে এ দাবী আছে বৈ কি। তবে, ভক্তি কাহাকে করি সেটাও একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেই জন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন ব্রাহ্ম সমাজের নয়, তখন বিধবা-বিবাহ দিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা ক্ষণিকের খেয়াল 'হেম ও তণীর' অবস্থা দেখিয়া করুণায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? এতে কি আপনার সত্যকার আপত্তি নাই? তা' যদি থাকে, অথচ একটা 'মিলন' হইয়া গেলেও মনটা খুসি হয়— এই যদি হয় ত এ 'মিলনের' বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে, লেখা হিসাবে অর্থাৎ রচনার ভাল-মন্দ বিচারে এ লেখার দাম ধার্য করিতে যাওয়া এটুকু চিঠির কর্ম্ম নয়।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাওড়া ২৯।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,— আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না—আমি এম্‌নি অগাধ কুড়ে।

তবুও আপনাকে দু'দুখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম যে কি করিয়া, ভাবিতে গিয়া দেখি ঐ যে আপনি ভক্তির দাবী করিয়াছেন,—উহাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বস্তুটা মানুষকে দিয়া কত অদ্ভুত কার্য্যই না করাইয়া লয়। আমাকে যে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে, তাহাকেই চিঠি লিখিতেছি, তাহার কথার উত্তর দিতেছি,— ইহার অন্তরে কি বিপুল অহঙ্কারই না প্রচ্ছন্ন থাকে!

আপনাকে আমি কিছুই শিখাই নাই, কখনো চোখেও দেখি নাই, কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কি পরিচয় কিছুই জানি না, অথচ, নিজেকে যখন আপনি আমার ছোট বোন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন,—এ সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে,—তখন, এ ভাগ্য যাহার ঘটে, তাহাকে একপ্রকার নেশার মত পাইয়া বসে।

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দুঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমিও যে আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পারি প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনের মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পারিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমার বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুসি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্ব্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্ব্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে, স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে, ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজকাল রাশি রাশি বাঙলা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে,—শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রী হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার

পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,—স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কাহারো চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। "যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই…"

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

"হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা নাই তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?"

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।—

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর। হাওড়া। ১৪. ৮. ১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত রাত জানালা খুলে শুই। সেদিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এম্‌নি ভিজেচে যে শীত করচে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হয়ে পথে কম ভিজিনি,—ছুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বরের মত হল কিন্তু একদিনেই সারলে

না,—বাড়্‌তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরও চমৎকার। ক'দিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটে নীচের এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগ্‌ল যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। দিন চারেক পূর্ব্বে একদিন সকালে উঠে দেখি খানিকটে বায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন একজিমার ভাব হয়েছে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছুদিন থেকে শুন্‌ছিলাম এদিকে খুব বেরি-বেরি হচ্ছে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাইনি, ভাবলাম বুঝি, আমাকেই ধরেচে। ভয়ে যাই আর কি। ক'সে টিনচার আইডিন লাগাতে সুরু করে দিলাম,—কিন্তু বার কয়েক ঘন-ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরি-বেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বক্‌তে লাগলেন,—আপনার কি এতটুকু কোন বিষয়ে সবুর নেই? এবার না হয় কষ্টিক কিম্বা এ্যাসিড-ট্যাসিড লাগিয়ে যা পারেন করুন আমি চল্‌লাম। যাই হোক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ঔষুধ আর মালিসের ব্যবস্থা করে হুকুম করে গেলেন, পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে দিয়ে যেন চুপ করে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়,—কোন কালে আমি অম্বলের রুগি নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্‌চে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিষ সহজে মুখে দিতে চাইনে,—আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ীর লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাত্তি হয়ে উঠ্‌ব। স্বর্গীয় গিরীশবাবু তাঁর আবু হোসেনে লাখ কথায় একটা কথা বলে গিয়েছেন যে "অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।" মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন! আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আস্‌চি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুল্‌লে! বাস্তবিক, আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না! আর তা যদি হয় ত আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই!

হাঁ, আরও একটা আছে। দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ধেড়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে

গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে এ কথা বলিনি, শুকিয়েও গিয়েছিল কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।

কিন্তু আর নয়, আপাততঃ এইখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েচি। এখন থেকে এমনি একটা-না-একটা উপলক্ষ করে ত চল্‌তে হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ দৈন্য আপদ বিপদের মাঝখান দিয়ে ত আজ চল্লিশের কোটা পার হোলাম—শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছোন নি। সে হিসেবে ত অন্ততঃ পিতৃ-পিতামহদের হারিয়েছি! আর কি চাই!

যাক্‌গে। বুড়ো মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাইনে, কিন্তু তুমি ত দিদি তেমন ভাল নেই? শরীরে যত্ন কোরো,—এখন পরিশ্রম করার দরকার নেই, ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে এসো তার পরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পড়লাম,—সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয় "ঘটে যা তা সব সত্য নয়,

কবি তব মনোভূমি, রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এতবড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য, যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে কেটেকুটে দিয়ে দূর থেকে বসে ততটুকু হবে না, তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈ কি। আর যদি এবারেও শীতের পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে পারি ত, তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ী নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে ত বাস্ এই পর্য্যন্তই।

…মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ করি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূর থেকে শুন্‌তেই……মহিলারা! উচ্চ শিক্ষিতা! দু'চারজন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্চি—তাই তাঁরা আমার সাম্‌নে কিছুতে স্বস্তি পান না,—অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদের মত সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাঙলা দেশে

আর নেই! দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার করিনে, কিন্তু··· মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ-মা দুজনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েচে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ·····সমাজ-ভুক্ত হোন্ তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো-জাত হলে আমি তাদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড়-বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয় ·····মেয়েদের মধ্যে সাজে পোনর আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের ঘারা আর নাকি খোনা গলার কথা করে যত দূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেচি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

এই মেয়েদের নিন্দে করচি বলে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্চে, কিন্তু জানই ত দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা কত স্নেহ। শুধু তাদের জাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জ্জিত আলোয় দগ্ধ,—এবং যা সত্য নয় তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বোল্‌ব, এদের ডজনখানেক গাড়ী বোঝাই করে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম! আর কিছু না হোক ভায়ার কাজে লাগ্‌তে পারত।

"দাদার মর্য্যাদা?" কি করে জান্‌বে তোমার ত দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুসি হলাম। আমি তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করচি। কিন্তু দিদি, একটি কথা তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছে করে। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে জন্যে হয় সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ সকল কথা হয়ত তুমি সব বুঝবে

না, আমার বলাও হয়ত সাজে না, কিন্তু,—সব চেয়ে বড় কথা এই যে তুমি ত শুধু মেয়েমানুষই নও,—আমার ছোট বোন কি না! আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

"কাহিনী"র ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা যদি হয় ত বাহাদুরী আছে বটে! সাহসের ত অন্ত নেই দেখি! কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানিনে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্ম্মলচরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে! তোমাকে দিদি হয়ত বলতেও পারে। কারণ বয়সে হয়ত তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হবে না এই ত আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো কোন ক্ষতি নেই। আর তা ছাড়া তুমি নিজেও ত খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্য্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুনতে পাই সে না কি এরি মধ্যে চারি দিকে রাষ্ট্র করে বেড়াচ্চে যে অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে কারও চেয়ে ছোট যায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ওই মিলনটা ছাপাবার জন্যে আমার খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বল্‌বে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকের অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য্য ধরে এক বৎসর অপেক্ষা করে যখন মাসিক পত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাক্‌বে না।

আমি ত তোমাকে শিষ্যা করতে সম্মত হয়েচি, কিন্তু দেখো বোন্, শেষকালে বুড়ির মত যেন গুরু-মারা বিদ্যে পেয়ে বোসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই, হয়ত বা শেষকালে তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্র কিছুই নয়,—কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এতে স্বীকার কোরব যখন তুমি লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাক্‌সেস কোরব না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখচি। আমি কষ্ট করে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ সরে পড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে "আপনার জানিত শ্রীরামপুর।" আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত? তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুল্‌তে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ নিতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি 'ছোড়্, দি'।

ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয়নি তখন আমি ওই ডিহরীর

ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর মাস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা! তখন রেল হয়নি ছোট ষ্টীমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হোতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্চি। আচ্ছা, তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য্য উঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেচি কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না।

"ভবঘুরে"র ত কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না! আচ্ছা, বর্ম্মার অত কথা জানলে কি করে? ম্যাজিষ্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে 'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডলে থেকে যে ল্যাঙ্কে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বললে? যদি যথার্থই বর্ম্মায় থেকে থাকো সে কোন জায়গায়? ও দেশটার হেন স্থান তো নেই যেখানে এ দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েচে! অথচ আমার মত বাদশা-কুড়েও দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইত নয়! ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি কি সত্যি? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্ব্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীর অযত্ন কোরো না। তোমাকে দেখিনি তবুও কেন জানিনে তোমার উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেচে। ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এমন মনে হচ্চে যদি না এত কুড়ে হতুম ত হয়ত শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখবার জন্যে কানপুরে যেতাম। কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করচি। তারা মা-বাপের গুণ যদি পায় ত সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। মরে গেলে কিছুতে চলবে না। তা হলে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে। দাদা

সত্যি বলচি তোমার ঐ গোছানো চিঠি লেখার কাছে আমার এই এলোমেলো চিঠি পাঠাতে যেন লজ্জাই করে।

আজকের গল্পর প্রথম অধ্যায়ের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

বাজে শিবপুর ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

পরম কল্যাণীয়াসু,—তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার-ব্রত জপ তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে

তার যা' কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে? যাক্। তোমার উপর আমার দ্বিতীয় আশা। তোমার যে বয়স এই বয়সই মানুষের রওনা হবার বয়স। তাই তোমাকে আমি শিখিয়ে নিতে চাই। আর এই জন্যেই তোমার কোন লেখা কোথাও ছাপাতে সম্মত হইনি। আমি নিশ্চয় জানি প্রথমে নিজের লেখা ছাপা অক্ষরে নিজের নামে দেখবার সাধ অনেকেরই হয়, কিন্তু এও জানি এক বছর তোমার সবুর সইবে।

কিন্তু লেখানোর সে সুবিধে নেই, থাকাও সম্ভব নয়। তবু একবার ওদিকে বোধ হয় যাবো, যেখানেই থাকি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াই সম্ভব। তোমার হয়ত একবার মনেও হ'তে পারে এই ত এঁদেরই বই পড়ি তা পড়েও যদি শিখতে না পারি, ইনি দুদিনে এমন কি শিখিয়ে আমাকে রাজা করবেন! এ কথা খুব সত্যি, বাস্তবিকই এ শেখবার জিনিষ নয়। তবু,—এই ধর না "তুলসী মৃত্যুকালে যখন তার···ইত্যাদি ইত্যাদি" আমি কিন্তু উপস্থিত থাকলে লেখবার আগে তোমাকে এই কথাটা বলে দিতাম, যে তুলসী মরেছে, যে সমস্ত গল্পের মধ্যে আর আসবে না তার সম্বন্ধে পাঠকের বেশি কৌতূহলও থাকে না, সেটা আর্টের দিক্ দিয়েও অপলক্ষা। সুতরাং তার সম্বন্ধে প্রথমেই দু'পাতা ইতিহাস পাঠককে ক্লান্ত করে; আমি হ'লে কোথায় আরম্ভ কোরতাম বলবার পূর্ব্বে এই কথাটা বলতে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।

ধরো যদি এমনি কোরে সুরু হতো—একদিন তুলসীর মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মশেষে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। তাহার তেরো বছরের মেয়ে মঞ্জরী অদূরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের উপর নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার দীপ্ত রশ্মি কতক্ষণ ধরিয়া যে বিচিত্র রেখার খেলা করিতেছিল কেহ নজর করে নাই, হঠাৎ এক সময় তাহারই প্রতি তারা ঠাকুরাণীর চোখ পড়ায় তিনি যেন চমকিয়া গেলেন। মনে হইল ওই যাহার নশ্বর দেহের এইমাত্র সমাপ্তি হইল, সেই যেন অকস্মাৎ তাহার ছেলেবেলার মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি তুলনাহীন রূপ, তেমনি শান্ত মাধুর্য্য, মুখের উপর ঠিক যেন তেমনি বিষাদের গাঢ় ছায়া মাখানো। এবং এই সদ্য মাতৃহীনার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চিন্তার সূত্র অতীত দিনের অনেক সুখ দুঃখের কাহিনীর ভিতর দিয়া ছায়াবাজীর মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল সেই যে দিন তুলসী স্বামী হারাইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রথম পা দিয়াছিল, তাহার পরে কেমন করিয়া সে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপের লাবণ্য লোকচক্ষু হইতে একান্ত গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়া ইত্যাদি···

এই অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ এ কথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

তার পরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা মোকদ্দমার মধ্যে তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

আরও অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে যেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া না দিলে চিঠিতে লিখিয়া জানানো শক্ত। এইগুলোই একদিন তোমাকে বলিয়া দিয়া আসিব। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে সে আমার বিধাতা পুরুষই জানেন।……তুমি আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিও।

তোমার দাদা
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নেলীর বাবার ডায়েরি

ভূমিকা

নেলীর বাবাকে আমি অনেককাল হইতেই জানি। ভদ্রলোক আমাদের অফিসেই কাজ করেন। ভাল মানুষ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাধুবাবু বলে। নীতিদীর্ঘ আকৃতি, মুখমণ্ডলটা ডিমের আকার। নাকটা ঈষৎ চেপ্টা। অনেক পাস করিয়াও আমাদের অফিসেই কেরানী। অল্প মাহিনায় চাকুরি আরম্ভ করিয়া বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু সাহেব তাঁহাকে মানেন।

আমি তাঁহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। অতএব তাঁহার গৃহের খবর আমি রাখি। তাঁহার একটা বাতিক আছে নিত্যকার ডায়েরি লেখার। একটা বাঁধানো খাতার প্রতিদিনকার বিশেষ খবর লিখিয়া, একটি ঘটনার শেষে দাঁড়ি টানিয়া দেন। ঘটনা যেদিনই আরম্ভ হউক না কেন, যেদিন উহা পরিসমাপ্ত হইল সেদিনই পরিণতিসহকারে খাতার পাতায় উঠিল। চেষ্টা করিয়াও আমি এরূপ লিখিতে পারি নাই। লোভ

সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার কয়েকটি পাতা চুরি করিয়াছিলাম। চোরাই মাল একাকী ভোগ করায় বিপদ আছে। তাই কয়েকটি লেখা আপনাদের পড়িতে দিলাম। তারিখগুলি কোথাও বাংলা, কোথাও ইংরেজী ও যথেষ্ট গোল থাকায় বর্জন করিলাম।

কর্তন

আজ মাসের শেষদিন, মাহিনা পেলাম।

পঁচানব্বুই টাকা বারো আনা আমার বুকপকেটে।

মেয়েদের মত চুপিচুপি তাকিয়ে দেখি, টাকাগুলো যেন ফুলের পাপড়ির মত দেখায়, কি যেন বলতেও চায়।

ভাবছিলুম অনেক কথা :—

সিনেমাতে কয়েকটা টিকিট বুক করতে পারি—নাঃ, ঢুকব না।

সাড়ে পাঁচ টাকায় দু হপ্তার তেল হবে।

যদি এক সের মাংস কিনে নিই ?—না থাক্।

দোকানটায় ঢুকে নিশ্চয় বলব, দাও তো এক সের সন্দেশ।

আঃ, খুব সামলে গেছি। দোকানদার যেমন ক'রে ঠেসে ধরেছিল, টাকাটা মোটেই রক্ষে পেত না।

অনু আর মিনুর চুড়ি, কথা দিয়েছিলুম—নাঃ, ভেঙে ফেলবে।

ছোট খুকুর জন্যে চামড়ার জুতো—নেব না, না, না।

এক টিন সিগারেট আজকাল এক মাসের খরচা। থাক্ গে।

চায়ের সঙ্গে ভাল বিস্কিট—দরকার নেই।

তাকিয়ে দেখি টাকাগুলো যেন হাসছে।

বাসায় ফিরে রেশন কার্ড পরীক্ষা করতে লাগলুম।

আপিসের পত্রিকাটায় ওপর চোখ বোলাচ্ছি, নেলী এসে বললে, বাবা, ইংরেজী রচনাটা ব'লে দাও তো।

নেলীর মা জিজ্ঞেস করেন, আর দু টাকা চার আনা কি করলে ?

তীব্র চাহনিতে সন্দেহ কেন ? আপিসের চা ও খাবার কমিয়ে দিয়েছি। বললুম, মাসে তিন টাকা তো তোমারই বরাদ্দ রয়েছে।

বারো আনা বাঁচালে কেন ?—জিজ্ঞেস করলেন।

কি মুশকিল, গভর্ণমেণ্টের আপিসের মত, পয়সা বাঁচালেও হিসেব চাই !

নেলীর রচনাতে মন দিলুম—

"কাট ইওর ক্লথ একর্ডিং টু ইওর কোট।"

কেটে তো দিয়েছি সবই, হেহটা বাকি, তাই ভাবলুম—

"ভালো কাটার হবার আর কতকাল বাকি ? হাউ লং হাউ লং ও লর্ড !

স্টাণ্ডার্ড অব লিভিং

আজ ঘুম থেকে উঠে শুনি, নেলী মায়ের কাছে বলছে, মাছ না খেয়ে ইস্কুলে যাব না মা।

আমিও বললুম, তাই তো, আমিও ঢেকুর তুলতে তুলতে আপিসে যাব।

নেলীর মাতা কিন্তু পয়সা দিলেন হিসেব ক'রে, আলু, কুমড়ো, ঝিঙে নিয়ে বাকি বারো পয়সায় মাছ আনবে।

খরচা আমি করতে পারি, কিন্তু কি দরকার অশান্তির কারণ ঘটিয়ে ?

ভাবলুম, বড় পুঁটিমাছ কিনে আনব, ভাল দেখে।

ছাব্বিশ পয়সা হ'ল পুঁটিমাছের মূল্য, দরকার নেই তা হ'লে, কি আর করব ?

বারোটা পয়সা যেন ভারী হয়ে পকেটে প'ড়ে প'ড়ে হাসতে লাগল। পয়সা পকেট ভালবাসে, পকেটও তাকে চায়।

তামাক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম, যা খেয়ে গোষ্ঠীকে বাঁচাতে পারব।

ব'সে ভাবলুম, সে অনেক দিনের কথা। পয়সা যখন পকেটে ছিল বেশ। বাজারে বিস্তর পুঁটিমাছ ছিল। চার পয়সায় কিনেছিলুম। চচ্চড়িটা যৌবনের ভুলে-যাওয়া প্রেমের মত আজও মনে প'ড়ে যায়।

অমুকে সঙ্গে নিয়ে এসে নেলী বললে, বাবা, মাছ পেলে না ?

নেলীর বড় সহানুভূতি। তখন মাছের-আকৃতি একটা বিমান আকাশে উড়ে যাচ্ছে। রান্নাঘরে নেলীর মা কাকে ব'কে চলছেন।

আমি বললুম, লজেঞ্চুস এনেছি, এই নাও।

নেলী, খোকা, অমুর ভিড় হ'ল। বিলিয়ে দিলুম। ওরা মাছের-আকৃতি লজেঞ্চুস মহা আনন্দে চুষে খাচ্ছে।

মোড়ক-করা কাগজের টুকরোটা আমার হাতে রইল, তাতে পড়তে লাগলুম, বিলেতের কোন সায়েব ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বলছেন—

"ষ্টাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াও, তবেই স্বাধীনতা পাবে।"

গ্লুকোজ ডি

ভোরবেলা একটা কবিতা লিখব ভেবেছিলাম—

মনের যত ব্যর্থতা নিয়ে একটা প্রেমের কবিতা।

নেলীর মাতৃদেবী চা নিয়ে এসে বললেন, অমুর ভারি জ্বর এসেছে।

বললুম, হঠাৎ আজ কি ক'রে এল ?

কয়েকদিন সে আসছিল চুপিচুপি। আজ যেন যুদ্ধসাজে, কাঁপিয়ে, পেটের নাড়ী বিগড়ে দিয়ে এসেছে।

ভাবলুম, অতর্কিত আক্রমণের আগে নিশ্চয় ফিফথ কলাম পাঠিয়েছিল, ওরা বুঝতে পারেন নি।

যাক গে, হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে বসলুম।

নেলীর মা বললে, ওসব চলবে না, ডাক্তার নিয়ে এস।

বললুম, কেন, তোমার অসুখ হ'লে তো আমার ওষুধেই চলে।

ডাক্তার এসে বললেন, গ্লুকোজ ডি এক্ষনি কিনে আনুন।

কাগজ নিয়ে ছুটছি বাজার থেকে বাজারে—দোকান থেকে দোকানে।

মনে পড়ল, সেদিন একটা পারমিট পেয়েও ফিরিয়ে দিলুম।

বর্ষার ব্যাঙাচির মত দোকানে ক্রেতার দল কাঁপিয়ে পড়ে।

আমি শুনি, নেই স্যার, এইমাত্র ষ্টক শেষ হয়ে গেল।

অন্য এক দোকানদার বললে, বিলেতে মাল বুক হয়েছে।

বুঝতে পারলুম না, অমুকে বিলেত পাঠাব, না টেলিগ্রাম করব, না জাহাজ-ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করব। এদিকে আপিসের সময় হয়ে গেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, 'ওরে আমার গ্লুকোজ ডি !' ব'লে চীৎকার ক'রে কাঁদি।

রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে বসলুম। রেডিওটা বলছে, খাদ্য, ওষুধ ও পথ্য নিয়ে আমেরিকার জাহাজ— ধুত্তোর ! হাসি পাচ্ছিল।

একটা লোক বললে, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ?

অবশেষে গ্লুকোজ ডি পাওয়া গেল লোকটার কাছে, ভগবান মিলিয়ে দিলেন। ভগবান আছেন। কেমন ক'রে, কত পয়সা দিয়ে—তা খাতায় লিখব না।

গ্লুকোজ ডি আমার একদিনের আপিস-কামাই-করা কাব্য। এখনি সে কাব্য লিখব।

ফলাহার

ঘুম থেকে জেগেই শুনি, কাকের চীৎকার।

খুকুর কটি নিয়ে হানাহানি লেগেছে, নেলীর মা নেলীকে বকছেন।

অনেক রাত্রি অবধি উপন্যাস পড়েছি, কাজেই অলস দেহ।

গ্রাম থেকে পিসী ছোট ছেলে নিয়ে এলেন।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা করতে হবে। আমার মাহিনা আর রেশনের যে অবস্থাই হোক,

পিসীর চোখ মানবে কেন? নেলীর মা মুখটি গম্ভীর ক'রে এঘর ওঘর করতে লাগলেন। পিসী আমাকে এসে বললেন, ও মা, তোর শরীর এত খারাপ?

হাঁ-হাঁ ক'রে নেলীর মা-ও এল, বললে, এ বিষয়টাতে তোমার মোটেই লক্ষ্য নেই। আজই ডাক্তারের কাছে যাও।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলুম সেদিন সন্ধ্যেবেলা, বললেন, ও কিছু নয়, কিছু নয়। ভিটামিন সি আর ফলাহারের ব্যবস্থা করুন।

নিশ্চিন্তে সেদিন বাড়ি ফিরলুম, মনের মেঘটা কেটে গেল।

আপিসে একজন আমেরিকান আসতেন। ওঁর সঙ্গে খুব খাতির হ'ল, কথাটা ব'লে ফেললুম। তারপর একদিন ভিটামিন সি উনি এনে দিলেন অমনই। ওরা বড্ড ভাল লোক। কিন্তু, ফল খাব কোথা থেকে?

স্ত্রী আজ জিজ্ঞেস করলেন, আপিসে ফল খাচ্ছ তো রোজ?

হাঁ, খাচ্ছি। দেখছ না আমার শরীরটা কত ভাল হয়েছে।

আজ পিসীমার চিঠি পেলুম, বাবা, তোমার ফলের টাকাটা পথে আমাকে ধার দিয়েছিলে, তা কি আর কখনও ভুলব? তোমার মত সাধুলোককে সংসারে বিরল। গরিব পিসীমাকে কত শ্রদ্ধা কর, তা সংসারের কে বুঝবে? ভেবেছিলুম, কয়েকটা কলা আর আম পাঠাব, কিন্তু লোক পাওয়া যায় না। এখানে এগুলো অনেক দামে বিক্রি হয়। তোমার টাকা কবে যে পাঠাতে পারব, বলতে পারছি নে। অলঙ্কার বিক্রি করতে ইচ্ছে আছে। ইত্যাদি।

আজ চিঠি লিখে দিলুম, অলঙ্কার বিক্রির দরকার নেই। ফল আমি খাচ্ছি।

রাত্রি জেগে কাব্য পড়লুম :— আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

নেলীর নৃত্যে প্রথম পর্ব

বাবা, আমি নাচতে শিখব।

অবাক হয়ে বললুম, নাচতে? ভাবলুম, ইচ্ছেটা স্বাভাবিক। জেরা করলুম, হঠাৎ কেন তোর এ ইচ্ছে হ'ল?

ফিগারটা ভাল হবে বাবা, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, নাম হবে অনেক, তোমাকে সবাই চিনবে—ইত্যাদি।

আমাকে বিখ্যাত করবার বাসনা নেলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

ভেবে বললুম, তোর মা-ই যে নৃত্যকলার একমাত্র অধিকারী।

বাইজী পেয়েছ? ঘরের বউ নাচবে? ছড় দিয়ে এসরাজের চার তারে কে যেন জোরে ঘা দিলে। নেলীর মায়ের কণ্ঠের শব্দ।

বললুম, বিয়ের আগে শুনেছিলুম কি মিথ্যে যে, তোমার দেহে ও কণ্ঠে সরস্বতী ছিলেন?

সরোষে বললে, মিথ্যে পরখ করবার মুরোদ চাই, টাকা চাই। সবই হয়েছে আমার বরাতে, এখন নাচনেওয়ালী সাজাই বাকি।

রাগটা যে কোথায়, বোঝা দুষ্কর নয়। মেয়েকে বললুম, ভাবিস নে আমার এক বন্ধু সব জানেন, তাঁকে নিয়ে আসব একদিন।

তারপর একদিন বাড়িতে কীর্তন লাগিয়ে দিলুম। বন্ধু এসে গান করলেন, নাচলেন। ওস্তাদ লোক। স্ত্রী কিন্তু পছন্দ করলেন না। বন্ধুকে সেধে এনেও বিদেয় ক'রে দিতে হ'ল।

আজ আপিস থেকে ফিরে দেখি, আমার স্ত্রীর মাসতুতো ভায়ের ছেলে এসে ব'সে আছে। চা-টা খেয়ে অপেক্ষা করছে। আমি এলেই স্ত্রী বললেন, চিনতে পার নি? সমীর— প্রসিদ্ধ নাচিয়ে গাইয়ে। কত ছেলে মেয়েকে ওর—

সমীর চট ক'রে প্রণাম ক'রে বললে, নেলীর মুখে একটা ভক্তি ও দেবারাধনার শ্রী রয়েছে। ধরুন, 'আরতি নৃত্য', 'উমার তপস্যা', 'গৌরীর—' এসব চমৎকার হবে। আপনার নাম রাখবে।

হাঁ-না বলবার সময় হ'ল না। আমার নাম নৃত্যে? আমার নয়, ওর মাতৃদেবীর। ভক্তি তপস্যা এসব তো ভালই। মৌনতাকে সম্মতির কারণ ভেবে নেলীকে সমীরের সঙ্গে জোর ক'রেই পাঠালেন মাতৃদেবী।

চেয়ে দেখলুম, সামনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে অস্তগামী সূর্য, মেঘ পতঙ্গের মত ওড়না উড়িয়ে ছুটে আসছে। মেয়ের বিচ্ছেদ-দুঃখ তবু দূর হল না।

ভাবছি, গুণহীন বাপের আজকাল বিখ্যাত হওয়া কত সহজ ব্যাপার!

নেলীর নৃত্যে দ্বিতীয় পর্ব

মেয়েকে আর ধ'রে রাখতে পারব না ভাবছিলুম। নৃত্যের কণ্ট্রাক্ট ক'রে একশো টাকা এনে দিয়েছে মাকে।

কি বলব মেয়ের এই উপার্জনে? আমার এক মাস ওর একদিন। ভেতরকার সনাতন বাপটা গুমরে উঠল। যাবৎ বিয়ে না হবে, তাবৎ বাপেরই পূর্ণ অধিকার—এই না ছিল রীতি!

নেলী বললে, বাবা, সন্দেশ দুটো খাও।

মেয়েকে অবহেলা করতে পারলুম না। বাপ তা পারে না।

নৃত্যশিক্ষা ও নাচের কথা কখনও জিজ্ঞেস করি নি, মায়ের কাছেই হিসেব-নিকেশ চলে। নেলীও এড়িয়ে যায়।

নেলী বললে, বাবা, তুমি একদিনও আমাকে জিজ্ঞেস কর না।

কি জিজ্ঞেস করব মা?

কোথায় যাচ্ছি, কি করি, কেমন করে চলি, কোথায় টাকা পেয়েছি।

আমার ভেতরকার বাপটা ভীত হয়ে বললে, জিজ্ঞেস কি করব? তুমি তো আমারই মেয়ে, নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে জান। তুমি নিজের সম্বন্ধে বড্ড হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার হয়েই মেয়েরা যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলবে। পথ বড্ড পিচ্ছিল মা, বড্ড খারাপ।

পেছন থেকে হুঙ্কার দিয়ে নেলীর মা বলেন, কি হচ্ছে? খুকুকে একবার ধরবি নে? কি পরামর্শ চলছে? সমীর ভাল ছেলে, ওর ভার নিয়েছে, এতে ভাবনার কি আছে?

আজ আপিসের এক ভদ্রলোক পত্রিকায় আমার মেয়ের ছবি দেখালেন, দেখুন মশাই, ভাল নাচছে আজকাল।

তাকিয়ে দেখলুম, তাই তো। মনটা খুশি হ'ল, কি দুঃখিত হ'ল? একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম, আমারই মেয়ে বটে। ভঙ্গীটা বোধ হয় কোন ভক্তিভাবেরই হবে। না, নৃত্যে তো আমার অধিকার নেই।

আমার নেলী কি সবাকার নেলী? ভয় হ'ল।

লজ্জা করছে কি? না। ভয় হচ্ছে কেন?

আমাকে বিখ্যাত করেছে আমার নেলী।

আদর্শ জন্মদাতার খ্যাতি কি না বুঝতে পারছি না। নৃত্য তো আমার পূর্বপুরুষও জানতেন না। আমি কি জন্মদাতা?

নেলীর নৃত্যে তৃতীয় পর্ব

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব'সে তামাক খাচ্ছি, অনু-মিনু অদূরে পড়ছে।

আজকাল সময় থাকে না নেলীর, আমাকেই পড়াতে হয়।

এমনই ক'রে ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে কতকাল কাটবে?

হঠাৎ অসময়ে নেলী বাড়ি ফিরে এল খোকাকে নিয়ে।

গৃহিণী বললেন, এ কি, হঠাৎ ফিরে এলি?

সংক্ষেপে জবাব দিলে, ফিরে এলুম বাবা।

মা বললেন, যাস নি তুই? যাবি নে আজ?

নিরুত্তর।

মাতা বললেন, আজকের কণ্ট্রাক্ট কি হ'ল? ওরা নেয় নি?

নেলী আমার পাশে ব'সে বললে, ফিরে এলুম।

ফিরিয়ে দিলে ওরা? ওগো, কেস কর ওদের নামে।

নেলী বললে, কি হবে টাকা দিয়ে? বাবার মাইনেতেই চলবে।

আমি বললুম, কেন ফিরে এলে বল তো?

তোমার কাছে ব'সে ওদের পড়াব ব'লে এসেছি।

মাতা বললেন, কি বললি? পড়াবি ব'লে এসেছিস? আবার উদ্ধত কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয় তোমারই উপদেশ।

নেলী ওদের সমুখে গিয়ে চুপ ক'রে বসল। আমি রেগে বললুম, হ্যাঁ, আমারই উপদেশ। আশ্চর্য এদের প্রকৃতি!

মেয়ে বললে, আর আমি যাব না, সমীরদার সঙ্গে কক্ষনো না।

নেলীর মা বললেন, সমীরের মতন এমন পরোপকারী ছেলেকে আমি আর কি বলব?

সহসা সমীর এসে নেলীর মাকে ডেকে নিয়ে গেল। ঘর থেকে কি কথা ব'লে বেরিয়ে এসে বললে, নেলী, চল আজকের কণ্ট্রাক্টটা শুধু। চল।

নেলী বললে, দয়া ক'রে চ'লে যান আপনি, আমি যাব না।

নেলীর মাতা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল। সমীর বেরিয়ে গেল।

নেলী আমার পাশে বসল, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলুম। আস্তে আমার কানের কাছে বললে, বাবা, ওর দোষ নেই। সংসারের নিরানব্বই জন লোকের মন সমীরদা হয়ে ব'সে আছে।

বেঁচে থাক্ ওর ভেতরকার অগ্নি। এর নামই 'ভাস্বতী' দিয়েছিলুম।

আমিই নেলীর বাবা।

খাদ্য জন্মাবার কাজে

আরও খাদ্য জন্মাবার প্ল্যান ক'রে সিমেণ্ট-করা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের কাছে বক্তৃতা করলুম। নেলী, খোকা, অনু, মিনু সব বড় খুশি হয়ে গেল। বললুম, সত্ত ভিটামিন জন্মাতে হবে।

নেলীর মা আমাকে বললে, এখানে মানুষের বাচ্চাই জন্মায় ভাল, আর জন্মায় টিকটিকি, আরশোলা, ছারপোকা এসব।

মাহিনার টাকা পেয়ে কিনলুম মাটি আর টব। বাচ্চারা সব খুশি হ'ল, নেলীর মাতা নিঃশব্দ বোমা হয়ে রইলেন। ফাটবার ব্যাপারটা আপাতত মুলতবি রইল। অবুঝ স্ত্রী নিয়ে সংসার বড় বিষময় ব্যাপার।

ছুটো টমাটোর গাছ সবুজ পাতা নিয়ে জন্মাল। একটাতে রইলুম আমি, অনু আর মিনু। আর একটাতে বড় খোকা আর নেলী।

স্নিগ্ধ সবুজ ডগায় বুঝি খাদ্য জন্মাতে আরম্ভ হ'ল।

একদিন ঘুমের ঘোরে ভীষণ চীৎকার শুনছি। খোকা আর নেলীর গাছে কুঁড়ি ধরেছে ছুটো। ফলও হবে। তাই গাছ ওরা দেওয়ালের ওপর উঠিয়ে রেখে দিলে যেন ধরতে না পারে কেউ। মিনু জিজ্ঞেস করছে বারে বারে, বাবা, আমাদের গাছে কবে ফল ধরবে?

আপিস থেকে এসে দেখি, কুরুক্ষেত্র। নেলী আর খোকার গাছের ফল উধাও হয়ে গেছে। মিনুর মা হাসছেন। খোকা আর নেলীর গাচের কচি ডগায় ক্ষত দেখা যাচ্ছে।

মিনুকে জিজ্ঞেস করি, কি হ'ল রে ওদের ফল?

কানে কানে বললে অনু, বাবা, আমরা ফেলে দিয়েছি ছিঁড়ে।

বছর ঘুরে গেল, অনু আর মিনু নিরন্তর জিজ্ঞেস করছে, বাবা, আমাদের গাছে ফল জন্মাবে কবে?

দুষ্ট খোকা ওদের ঘাবড়ে দেয়। নেলী সস্নেহে বলে, হবে, হবে।

আমি আশ্বাস দিচ্ছিলুম, নিশ্চয় হবে ফল। পরিশ্রমের মূল্য আছেই আছে। শুনিস নে, খোকা পঙ্কে অধ্যবসায় ইত্যাদি। অবুঝ ওরা।

অন্ত শনিবার ইং ঘণ্টা ৬।৪৭।২১ গতে সূর্যোদয়ারম্ভে, চিত্রানক্ষত্রে কন্যারাশিতে শূদ্রবর্ণে নেলীর মাতা এক কন্যার জন্ম দিলেন।

সম্পত্তি

ঘুষ যাঁরা খান, তাঁদের আন্তরিক ঘৃণা করি। আপিসে সকলেই ঠাট্টা করে। "সাধুবাবু" ব'লে ডাকে। বলুক ওরা। স্ত্রী মাঝে মাঝে এটা ওটা ব'লে উপদেশ দেন, সংসারে সবাই এক রকম চলবে, তুমি অন্য রকম হবে এ তো হতে পারে না। তা হ'লে যে'খা না ক'রে সন্ন্যাসী হ'লেই পারতে। চুপ ক'রে শুনি আর ভাবি।

কণ্ট্রাক্টর হরেন মুখুজ্জের বিলটা বড় সায়েবকে দিয়ে পাস করিয়ে দিলে পঁচিশ টাকা দেবে। দিনে পয়সায় ক'রে দিই। সায়েব আমাকে সম্মান করেন, ভয়ও করেন।

হরেন মুখুজ্জে এবারে একটা কণ্ট্রাক্টে একশো টাকা দিতে চাইলেন। তাড়িয়ে দিলুম, আস্কারা পেয়েছে। নিধুবাবু লোকটা ভাল, ব'লে-ক'য়ে কাজটা ওঁকেই দিলুম।

বাড়ি ফিরে শুনি নেলীর মা বলছেন, হরেন মুখুজ্জের কাজটা হ'ল না বুঝি?

তুমি কি ক'রে জানলে?

ওরা যে খবর দিয়ে গেল।

তুমি ওদের চেন কি ক'রে?

হরেন মুখুজ্জের স্ত্রী এসেছিলেন, বড় ভালমানুষ। দুবার নেমন্তন্ন খেয়েছি।

আমি কোথায় ছিলুম?

তুমি আপিসে। নেমন্তন্ন না গ্রহণ করা অভদ্রতা। তাই গিয়েছিলুম।

এসব কি ভাল?

মন্দটা কি শুনি? এর পরের কাজটা ওকে দিতেই হবে কিন্তু।

আমি কেরানী মাত্র। কি ক'রে বলতে পারি?

আজ আপিসের আর একটা কাজ বিলি হবে। হরেন মুখুজ্জের জন্যেই বলব ভাবছি। নিধুবাবু এসে টিপ ক'রে প্রণাম ক'রে বললে, সাধুবাবু, কাজটা আমিই পেলুম।

বললুম, তা কি ক'রে হবে? হরেন মুখুজ্জের রেট কম রয়েছে।

নিধুবাবু নমস্কার জানিয়ে ব'লে গেল, আপনাকে বলতে কি, এজন্যে দু হাজার খরচ হ'ল।

নিধুবাবু চ'লে গেল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে। ভাবলুম, ওকে কায়দা ক'রে ধরব। বড় সায়েবকে ঘুষ দেওয়ার ফল ওকে ভোগ করতেই হবে।

স্ত্রী বললেন, হরেন মুখুজ্জেকে কাজটা তো দিতে পারলে না? নিধুবাবু দু হাজার টাকা ঠুকেছে। অথচ— থেমে বললে, ওরা আমার কাছে চারশো টাকা রেখে গেছে।

মাথার শিরাগুলো দব্‌দব্‌ ক'রে উঠল, তুমি টাকা নিয়েছ? এ পাপ আমার ঘরে?

বললে, কি বললে? পাপ! আর পাগলামো ক'রো না। এ টাকা ওরা ফিরিয়ে নেবে না।

নেবে না? তুমি রাখবে?

নিশ্চয় রাখব। কি করবে তুমি? বরং পরের কাজটা ওকেই দেবার জন্যে চেষ্টা করবে তুমি।

স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হলুম। নিধুর সর্বনাশচিন্তা মন থেকে দূর হয়ে গেল। জগৎটা যেন আমার মনের সম্পত্তিটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। নেলীর মা আবার এসে নরম সুরে চা ও খাবার খেতে অনুরোধ ক'রে গেল। হরেন মুখুজ্জে হয়তো এবার সায়েবকেই ধরবে। খোকাটা ইস্কুলের পড়া শিখছে, অনেষ্টি ইজ দি বেষ্ট পলিসি।

ধমকে বললুম, পড়িস নে, চ'লে যা এখান থেকে। আমার বাড়িতে আর 'অনেষ্টি' কেন?

খোকা অবাক হয়ে গেল। নেলীর মা এসে বললেন, ও কি ছেলেমানুষি করছ? রাগ করবে জানি। কিন্তু আমি আমার সম্পত্তি ছাড়ব না। খোকা আবার পড়তে আরম্ভ করল।

মদ

মদ খাওয়া বড় দোষ।

খোকা জিজ্ঞেস করলে, বাবা, মদ কি ?

বললুম, মদ একপ্রকারের ওষুধ। ও তোমার মা খান।

ওষুধ খেলে দোষ কেন হবে বাবা ?

ওষুধ খেতে দোষ নেই, এমনি খেলে দোষ আছে।

লোকে এমনি খায় কেন বাবা ?

খেতে খুব ইচ্ছে করে, তাই।

ইচ্ছে করে কেন ?

নেলী দূরে ব'সে 'লজিক' পড়ছিল, হঠাৎ ভেংচে দিল, অ্যাঁ, তুমি কচি খোকা আর কি ? দেখতে পাও না রাস্তায় লোকগুলো চুলতে চুলতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায়।

বললুম, আহা বকিস নে, জিজ্ঞেস করতে দে।

নেলী নীরব হ'ল। খোকা বললে, খেয়ে লোকটা প'ড়ে যায়, তবু খায় কেন বাবা ? খেতে কেমন লাগে ?

খোকার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। একটি মাত্র ছেলে, ওকে মানুষ ক'রে তুলতে আমায় সাধনা করতে হবে। বললে, বাবা, তুমি খেয়েছ কখনও ?

দেখলুম, নেলী তীব্র দৃষ্টি বর্ষণ করল। আমি সত্য বললুম, খেয়েছিলুম, যখন খুব পড়াশুনো করতুম। কতকটা বানিয়ে বললুম, মাথাটা ঝিমঝিম করত, তাই দুধের সঙ্গে মিলিয়ে খেতুম অল্প ক'রে। দেখ নি, শিশিটা থেকে তোমার মা আজকাল খান। ওষুধটা ভেতো।

খোকা কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, আমারও খেতে ইচ্ছে করে বাবা।

নিষেধ করাই পিতার কর্তব্য। কিন্তু শিশুর ঔৎসুক্যকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে হবে, আশ্বাস দিতে হবে, বুঝিয়ে দিলেই শান্তি। বললুম, ইচ্ছে হ'লেই কি সব করতে হয় ? আমার তো ইচ্ছে করে, মাইনের টাকা দিয়ে খুব ক'রে মেঠাই কিনে খাই। কিন্তু ইচ্ছেকে দমন করি। দমন না করলে রঙবেরঙের ইচ্ছে হবে। ওর নামই লোভ। যত বাড়াও, তত বাড়বে।

আজ আপিস থেকে ফিরে ভাবছি বিশ্রাম করব।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খোকা কাতরে কাতরে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে ?

নেলী বললে, বাবা, খোকা মদ খেয়েছে।

অ্যাঁ !

শিশিটা হাতে নিয়ে আবার বেরুতেই হ'ল।

শ্রীসুকুমার রায়

সংবাদ-সাহিত্য

কলিকাতায় সম্প্রতি-আরব্ধ সাম্প্রদায়িক নরমেধযজ্ঞের কথা ভাবিতেছিলাম। হোমানল এখন তেমন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে না, মানবীয় আহুতির পরিমাণও তেমন বিপুল নয় ; কিন্তু অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই, তুষানলে পর্যবসিত হইয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। শ্রাবণের শেষে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, আজ আশ্বিনের দশ তারিখ হইতে চলিল, এখনও নিশীথনীরবতা বিঘ্নিত করিয়া "জয়হিন্দ" "আল্লাহো আকবর" মন্ত্র অতর্কিতে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতেছে, ছুরি ছোরা লাঠি ইষ্টকখণ্ডের ইন্ধন উৎসাহীরা আজিও যোগাইয়া চলিয়াছে ; শ্মশান-যজ্ঞের ধূম সমস্ত জনপদ আচ্ছন্ন করিয়াছে, পূতিগন্ধ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।··· এইভাবে বঙ্কিমী ভাষায় নেশায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিতাম, সহসা সামনের বাড়ির রেডিও হইতে সুমধুর সুরলহরী কানে আসিয়া বাজিল। চকিত হইয়া উঠিলাম। রাত্রির অন্ধকার বেশ ঘোরালো হইয়া আসিয়াছে, সান্ধ্য-আইন-মহিমায় পথে জনমানব নাই। নিবিড় নীরবতার মাঝখানে গানের সুর কানে আসিয়া মুহূর্তমধ্যে কলিকাতার বর্তমান পরিবেশ ভুলাইয়া দিল। সুরের লহরী-লীলায় দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত মন ক্রমশ ভারমুক্ত হইয়া কখন যে অসাম্প্রদায়িক মুক্ত আকাশে বিহার করিতে লাগিল, হঠাৎ চমক ভাঙিল ঘোষকের ঘোষণায়—খাঁ সাহেব আর একটি গান গাহিবেন। খাঁ সাহেব ? মুসলমান ? কিন্তু মনকে বিবিধ চাবুক কষিয়াও কিছুতে সাম্প্রদায়িকক্ষেত্রে নামাইতে পারিলাম না। খাঁ সাহেবও নিশ্চয়ই আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণবিরহের কাহিনী সুরে প্রচার করিতেছিলেন, সুর যেন কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। মিঃ জিন্না, লিয়াকৎ আলি, ডক্টর মুঞ্জে, আশু লাহিড়ী সকলের সর্ববিধ সতর্কবাণীকে অতিক্রম করিয়া ওই অজ্ঞাত অপরিচিত, হয়তো দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন লুঙ্গি-পরিহিত খাঁ সাহেবের সহিত প্রগাঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিলাম। লজ্জা বোধ হইল কি ?

• • •

ভাবিতে বসিলাম, মনের কোন্ অবস্থাটা সত্য ! শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিধর্মের গণ্ডী কেন টানিতে পারি না, অথচ, রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে সেই গণ্ডীই এমন নিরেট এবং বিরাট হইয়া দেখা দেয় কেন ? জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি যখন দেখি, তখন কল্পনাই করিতে পারি না, শিল্পী কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ! নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের দুঃখে তাঁহার বেদনা ও সহানুভূতি রেখায় রেখায় বিগলিত হইয়া মনকে স্পর্শ করিয়া যায়। কাজি নজরুল ইসলাম রচিত সঙ্গীত যখন শুনি, তখনই অনুভব করি, জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়া তরঙ্গ-তুফান-তাড়িত মানুষ শুধু ডুবিতেছে, মানুষ যদি কেহ থাক, তাহাকে বাঁচাও, হিন্দু কি মুসলমান সে হিসাব তুলিও না। মীর

মশার্‌রফ হোসেন সাহেবের 'বিষাদ-সিন্ধু' যখন পড়ি, তখন এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করি না, এ কারবালা আমার কারবালা নয়; কিছুতেই মনে রাখিতে পারি না যে, এই মহরমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষ বার বার রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে।

• • • •

আসলে এই শিল্প ও সাহিত্যই হইতেছে মানুষের মিলন-সেতু। রাষ্ট্র বা সমাজ একই জাতির অথবা সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলে বটে; কিন্তু জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মের প্রসঙ্গ তুলিলাম না, কারণ ধর্ম বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তাহা ধর্ম নয়, বিভেদসৃষ্টির একটা কল মাত্র। সত্যকার ধার্মিক ব্যক্তি যে-ধর্মেরই লোক হউন, ভিন্নধর্মীর প্রতি তাঁহার কোনই আক্রোশ থাকিতে পারে না। যে ধর্মের কথা তুলিয়া মানুষে-মানুষে মাথা-ফাটাফাটি করে, তাহা বৃহত্তর নামের আড়ালে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। শুধু শিল্প ও সাহিত্যই মানুষের মনের মুক্তি আনিতে পারে। একজন সুরাবর্দী, একজন কিরণশঙ্কর রায়ের বুকে প্রয়োজন হইলে অবাধে ছুরি বসাইতে পারেন, একজন বিড়লা ইচ্ছা করিলে একজন ইস্পাহানিকে ইস্পাহান পাঠাইতে পারেন; কিন্তু আমাদের খাঁ সাহেব কখনই তাঁহার সঙ্গতকারী ভট্টাচার্য মহাশয়কে তালকাটা ছাড়া অন্য কোনও কারণে লগুড়াঘাত করিতে পারিবেন না, শিল্পী জয়নুল আবেদিনের হাতে শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর কোনও অবস্থাতেই বিপদের সম্ভাবনা নাই। ব্যাপক ভাবে বলিতে গেলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রই সত্যকার মিলনের ক্ষেত্র। শিল্প ও সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বাংলা দেশে যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি, তাহা প্রধানত সাম্প্রদায়িক, নূর ও টিকি-মাহাত্ম্য প্রচারই ইহার গোড়ার কথা। সে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আমরা প্রধান ও ব্যাপক স্থান দিতেছি না। যে শিক্ষায় মানুষের মনের মলিনতা দূর হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়, যে সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবার অবকাশ দেয়, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথাই বলিতেছি। বাংলা দেশে কখনও লীগ, কখনও হিন্দুমহাসভার আওতায় সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে। ফলে এখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমন প্রবল আকারে দেখা দিতেছে।

• • •

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করিয়া অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলে সমস্ত জাতিকে একজাতীয়ত্বে গড়িয়া তোলা বর্তমানে অতিশয় কঠিন এবং তাহা বহু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে, গ্রামে ও শহরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এমন ভীষণ আকারে দেখা দেয়, তাহার কারণ জনসাধারণের শিক্ষার ভার এখনও মূর্খ পণ্ডিত ও মোল্লাদের হাতে। পণ্ডিতেরা অন্ধ গোঁড়ামির বশে এক পক্ষকে দিনে

দিনে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিতেছে, মোল্লারা অন্য পক্ষকে শাস্ত্রের ও ধর্মের দোহাইয়ে উত্তেজিত করিয়া খুন জখম নারীহরণে প্রবৃত্ত করাইতেছে। ফল বর্তমানে সর্বত্র দেখিতেছি। মোল্লা ও পণ্ডিতদের তাড়াইয়া যতদিন সত্যকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপক প্রবর্তন না হইতেছে, ততদিন এই যন্ত্রণা আমাদিগকে সহিতেই হইবে। লীগের বা হিন্দুমহাসভার হাতে শাসনভার থাকিলে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই গুণ্ডামি ও গোঁড়ামিরই প্রশ্রয় দিবেন, এবং দিতেছেনও তাই। শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটিলে শিক্ষার দিক দিয়া আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

সুতরাং আপাতত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই দাঙ্গা-হলাহলি ও খুনাখুনির আবহাওয়ার মধ্যে খাঁ সাহেবের গান এই নির্দেশই দিল। শুধু ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নামে মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ কখনই চিরন্তন হইতে পারে না। এই বিদ্বেষভাবকে স্বার্থসন্ধী ব্যক্তিরা নানা কৌশলে জীয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা এই কাজে লোভের বশে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে পারেন; দুঃখের বিষয়, নানা সাময়িক পত্রের আশ্রয়ে বর্তমানে অনেকেই দেশের এই সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। একমাত্র 'আজাদে'র দ্বারা বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, একজন নাদিরশাহ বা সুরাবর্দী ততখানি ক্ষতি করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান মৈত্রীর জন্য আমাদের প্রথম আবেদন এই কারণেই সাহিত্যিক ও শিল্পী গোষ্ঠীর নিকট। মানসিক খুন জখম ও বোমাবর্ষণের কালে তাঁহারাই ব্লাড-ব্যাঙ্ক। সকলেই জানেন, সঞ্জীবনী রক্তসঞ্চার কখনই সাম্প্রদায়িকভাবে হয় না, তাহার জন্য অন্য গ্রুপিংয়ের বিচার আবশ্যক। একমাত্র শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই সেই বিচার করিতে পারেন।

—

সাহিত্যিকের অভিমানবশে মনকে খুব উচ্চস্তরেই লইয়া গিয়াছিলাম, সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পীড়া ভুলিয়া ভবিষ্যৎমিলনের রঙিন ছবি দেখিয়া প্রায় মশগুল হইয়াই উঠিয়াছিলাম, হঠাৎ পাড়ার ভিনকড়ি ব্যস্তভাবে আসিয়া খবর দিল, হ্যারিসন রোড হইতে লালবাজার থানার মধ্যে চিৎপুর রোডের মাঝখানে মুসলমান যোদ্ধারা ট্রাম-বাসের যাত্রীদের উপর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জুড়িয়া দিয়াছে। প্রায় ধপ করিয়া মাটিতে পড়িলাম। সাধারণ নাগরিকদের জীবন যদি এখনও ১৬ই আগষ্টের প্রায় দেড় মাস পরেও এভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই জীবধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, উচ্চচিন্তার অবকাশ থাকে না। যে সাহিত্য ও শিল্পের আশ্রয়ে আমরা ধরার মলিনতা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি, বর্তমান অবস্থায় তাহার চর্চা মোটেই সম্ভব নয়। দাঙ্গার পরে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, আত্মরক্ষার আর্তনাদ ছাড়া সেগুলিতে আর কিছুই নাই। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা স্তম্ভিত হইয়া আছেন। অবস্থা

যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাঁহারা কবে যে আবার আত্মস্থ হইতে পারিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গেলে এবং বর্তমান নায়কদের মহাপ্রস্থানের পর নব জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে হয়তো ভবিষ্যতের বেদব্যাস নবমহাভারত শুনাইতে পারিবেন, আপাতত আমাদিগকে হাড়গোড় রক্তমাংস জাতীয় তুচ্ছ বস্তুর চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

কিন্তু এ হইতেছে কি? বিংশ শতাব্দীর যাবতীয় মারণ-অস্ত্রের দ্বারা শক্তিশালী ইংরেজ-শাসন লাঠিছোরাসজ্জিত দুষ্কৃতদের গুণ্ডামি চেষ্টা করিয়াও প্রশমিত করিতে পারিতেছে না, ইহা হইতেই পারে না। এক দিনের এক ঘণ্টার সক্ষম শাসনে যাহাদের শায়েস্তা করা যায়, তাহারা অবাধে দিনের পর দিন দলে দলে সমবেত হইয়া কলিকাতার রাজপথে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে, নগরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করিয়া সাধারণের অন্নসংস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অথচ বর্তমান গবর্মেণ্ট গদিতে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছেন! পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশেই এইরূপ সম্ভব হইত না। গবর্মেণ্টই এখনও ইচ্ছা করিয়া ইহা ঘটাইতেছেন, স্বভাবতই ইহা মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে, ইউরোপীয়দের ইহাতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয় আছে। কোনও ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অথবা ইংরেজ নরনারীর ক্ষতি বা রক্তপাত হইলে কবে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিত।

"শান্তি শান্তি" করিয়া তথাকথিত "পীস"-কমিটিগুলি ছেলেখেলা করিয়া বেড়াইতেছেন, বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাঝে মাঝে বেতারে ও সংবাদপত্র মারফৎ রসিকতা করিতেছেন, অথচ ওদিকে যাবতীয় মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুরা প্রয়োজনবশত গেলেই প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছে অথবা সম্পূর্ণ গুম হইয়া যাইতেছে, ইহার কোনও প্রতিকারের চেষ্টা নাই। শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইতেছে, অথচ ট্রাম-বাসের যাত্রীদের জীবন নিরাপদে রাখিবার কোনই ব্যবস্থা নাই, লোকে কোন্ ভরসায় আর কাজে বাহির হইবে? গুণ্ডারা সকল আইন সত্ত্বেও অবাধে লাঠি-ছোরা-বন্দুক হাতে দল বাঁধিয়া মাতামাতি করিতেছে, কেহই তাহাদের বাধা দিবার নাই, অথচ বিপন্ন নাগরিকেরা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি সঙ্গে লইলেই তাহাদিগকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, উহাকে স্রেফ বদমাইসী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" কাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার বিচার হইবে, হউক। সাবজুডিস মামলা সম্বন্ধে মন্তব্যের অধিকার আমাদের নাই, কিন্তু এখন কাহারা এই নরমেধযজ্ঞকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য এনকোয়ারি কমিশন বসাইবার প্রয়োজন আছে কি? কোথায় কোথায় হাঙ্গামা ঘটিতেছে, এক নজর তাহা দেখিলেই এখনকার দৈনন্দিন হাঙ্গামার নায়কদের চিনিতে বিলম্ব হইবে না। হিন্দু-অঞ্চলে মুসলমানেরা

নির্ভয়ে যাইতে পারিতেছে, কিন্তু মুসলমান-অঞ্চলে হিন্দুদের যাইবার পথ নাই। হিন্দু-পরিত্যক্ত বাড়ি ও দোকানগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বত্ব ছাড়িতে লীগের বীরদের আপত্তি হইতেছে। তাহারা চোখ রাঙাইয়া অথবা বন্ধু সাজিয়া হুকুম কিংবা অনুরোধ করিতেছে তফাতে থাকিতে। মগের মুল্লুকের কথা শুনিয়াছি, মগের মুল্লুকেও সম্ভবত এরূপ হয় না। লালাবাগান রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে সেদিন দিনে-দুপুরে পঞ্চাশ-ষাট জন সশস্ত্র মুসলমান একটি বাড়ির উপর চড়াও হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, ইহাই বা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? সুরাবর্দী-বারোজশাসিত বাংলা দেশে, শুধু কলিকাতায় নয়, সর্বত্র দুঃশাসনদেরই প্রবল প্রতাপ। আমাদের হাত-পা বাঁধা, পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছি।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্র পথ আছে, অনশন অভ্যাস করা। শুধু উদরের দায়েই আমাদিগকে ঘরের বাহির হইয়া বেপাড়ায় যাইতে হয়, এবং বেপাড়ায় ছুরির আঘাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার কেহ নাই। সুতরাং আমরা যদি সমবেতভাবে প্রতিজ্ঞা করি, ঘরের বাহির হইব না, বাড়িতেই বরং অনশনে মরিব, আততায়ীর হাতে মরিব না, তবে অন্তত কিছুদিন শান্তিতে থাকিতে পারিব। সরকারী অফিস অথবা ইউরোপীয় সওদাগরী অফিস হইতে যদি কয়েক দিনের জন্যও কেরানী সম্প্রদায় অন্তর্ধান করে, তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তন হইলেও হইতে পারে। এই একটিমাত্র পথ, আর পথ নাই। গবর্মেণ্টকে এবং সওদাগরী অফিসের মালিকদের জানাইয়া আপাতত পনেরো দিনের জন্য আমরা অফিস কামাই করিব। ইহার মধ্যে যাঁহারা না খাইয়া মরিবেন, তাঁহাদিগকে শহিদজ্ঞানে চিরকাল তর্পণ করিব।

—

দাঙ্গা-কমিশন বসিয়াছে, ১৪ই অক্টোবর হইতে ইহার অধিবেশন বসিবে। ইতিমধ্যে বিবৃতিগ্রহণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অথচ দাঙ্গা থামে নাই। গত দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়া ভূত হইয়া যাইবার পর কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপই নিয়ম। যে ব্যাপারে কমিশন নিযুক্ত হয়, তাহার জের নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কমিশন বসিবার রেওয়াজ নাই। কলিকাতার লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নরহত্যার জের চলিতে চলিতেই কমিশন বসাইয়া বাংলা সরকার চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতেছেন। যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের নিরাপদে চলাফেরা করার অধিকার না জন্মিতেছে, ততক্ষণ কমিশনের কাজ আরম্ভ হইতে পারে না। এ বিষয়ে গবর্মেণ্ট পুনর্বিবেচনা করিবেন কি?

—

পুলিস হিন্দু-মহল্লা হইতে আত্মরক্ষাকারী এবং পাড়ারক্ষী যুবকদের অবাধে বিনা কারণে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশীয় সাময়িক-পত্রসমূহে বার বার প্রতিবাদ জানানো হইতেছে। এইরূপ অরণ্যে রোদনের কোনই সার্থকতা নাই। আমরা কোন্ মগের মুল্লুকে বাস করিতেছি, অ্যাসেম্ব্লি ও কাউনসিলে অনাস্থা প্রস্তাবের অবস্থা

দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইতেছে? বিড়াল-রাজ্যে ইঁদুর-লাঞ্ছনা হইবেই। আর এই ট্যাক্‌টিক্‌স্ কি তাঁহারা আজ ধরিয়াছেন? ঢাকার হাঙ্গার সময় সক্ষম হিন্দু যুবকদের জেলে পুরিয়া পুলিস-পাহারায় অবাধ লুঠতরাজ-খুনজখমের অধিকার দেওয়া হয় নাই কি? কলিকাতাতেই বা ভিন্ন আইন চলিবে কেন? সুতরাং হিন্দু যুবকেরা ধরা পড়িবেই। যাঁহারা ধরা পড়িবেন না, তাঁহারাই আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন। যতদিন না আমরা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইতেছি, ততদিন এইরূপই হইতে থাকুক; কান্নাকাটি করিয়া আর লজ্জা বাড়াইবেন না।

—

নিরপেক্ষ কৃষ্ণপন্থী কমিউনিষ্টদের মহিমা আমরা চিরদিন স্মরণ রাখিব। ১৯২৬ সালের হাঙ্গার সময় ইঁহারা এভাবে সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়াও অনুরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। হিন্দু নামধারী কমিউনিষ্টরা গত নরমেধযজ্ঞে কোন্ চিহ্নের বলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীযুক্ত পি. সি. জোশীর শাসন কি আর চলিতেছে না? তিনি তো উচ্চকণ্ঠে লীগের স্বরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—লীগ ব্রিটিশবিরোধী নয়, কংগ্রেসবিরোধী। যাহারা ব্রিটিশবিরোধী নয়, কমিউনিষ্টরা স্বভাবতই তাহার বিরোধী। সেই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিল কেন?

—

কলিকাতা করপোরেশনে মেয়র মিঃ ওসমানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের মামলা যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি দৈনিক পত্র উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—প্রহসন, কেহ বলিয়াছেন—রীতিমত নাটক। ভুল বলিয়াছেন। নাটক ইহা মোটেই নয়; অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ, ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের প্রবন্ধ। কলিকাতার করপোরেশনের করদাতারা ক্লোরিন-মিশ্রিত জল খাইয়া খাইয়া প্রত্যেকেই ব্লিচিং পাউডার বনিয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসে মুখুজ্জে ও রায় চৌধুরী মহাশয়েরা এতখানি নোংরামি করিবার ভরসা করিয়াছেন, মহামারীর আশঙ্কা তাঁহারা করেন নাই। এই দুর্জয় সাহস তাঁহাদিগকে আমরাই দিয়াছি। যে সকল অভিযোগের মূলসুদ্ধ মেয়র মহাশয়ের মুখের ফুৎকারে হাওয়া হইয়া গেল, সে সকল অভিযোগ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঘুস খাইয়াছেন, না গাঁজা খাইয়াছেন, এই চিন্তাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। যে পুস্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা যে দাখিলীকৃত ও পঠিত হওয়া উচিত ছিল, ইহাও কাহারও মনে হয় নাই; চরি ও রেশন রহস্য করপোরেশনের কর্মচারীরাই উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিতেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ ঘটা করিয়া পৌর-প্রধানদের সভা বসিয়াছিল! পাঁচ হাজারের অধিক নগরবাসীর নৃশংস হত্যা যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি এতটুকু টলাইতে পারে নাই, তাহারা যে কত উচ্চশ্রেণীর পিশাচ তাহা কি কলিকাতাবাসীরা কোনদিনই বুঝিতে পারিবে না!

—

এই গেল কলিকাতার হত্যালীলার গম্ভীর দিক, লঘু দিকও একটা আছে। অবিমিশ্র-পাড়ার সান্ধ্য আড্ডায় নানা গুজব গল্পের আকারে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। কোনও উৎসাহী ব্যক্তি এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে শান্ত আবহাওয়ায় একটা নতুন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ইহার অধিকাংশই প্রকাশ-যোগ্য নহে। দুইটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক কাহিনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

হাঙ্গার চতুর্থ দিনে প্রবল আশঙ্কা উত্তেজনার মধ্যেই আসর জমিয়াছিল, গুজববাহী দুর্মুখ-সুমুখদের ভিড় কম হয় নাই; অনেকেই দশহাজারী পাঁচহাজারী মনসবদার। শুনিতে শুনিতে রক্ত কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। খুব যখন জমিয়া উঠিয়াছে শ্রীমান জহর গাঙ্গুলী উত্তেজিতভাবে ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রবেশ করিলেন। নানা কারণে তাঁহার একটু ঘমিয়া থাকিবারই কথা। আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি রুমাল সহযোগে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার গুজবীদের দেখিয়া লইলেন, বসিবার আসন না থাকাতে মুখে একটু অপ্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল, ভাবখানা এই, যত সব বাজে লোক এসে জুটেছে! যিনি সদ্যসদ্য মোমিনপুরের কাহিনী বলিতেছিলেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন, থামলেন কেন মশাই, চলুক না, চলুক, চলুক। ক হাজার মারলেন আজ? ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত ভাবে প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, বাইরে থেকে আসছেন মনে হচ্ছে, কদ্দুর গিয়েছিলেন? জহরলাল দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিলেন, বেহালা, বেহালা। প্রশ্নকর্তা সোৎসাহে বলিলেন, দেখলেন কিছু? জহরবাবুর গরম ততক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়াছে। মুখে আতঙ্ক-বিস্ময়ের ছায়া ফেলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই, সাংঘাতিক কাণ্ড! ব্লাইণ্ড স্কুলের ছেলেরা সব ক্ষেপে বেরিয়ে পড়েছে। যাকে সামনে দেখছে তাকেই কচাকচ কাটছে, সাতশো তেরো জন শুনে এলুম।

প্রশ্নকর্তার হাসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরের কথা। কলিকাতার অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার মুখে আড্ডায় বসিয়া তরিতরকারি-মাছের বাজারদর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, হঠাৎ একটা হল্লার আওয়াজ কানে আসিল। মনে হইল, ওই রে, আবার লাগিল বুঝি! তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আতঙ্কগ্রস্ত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। দোকানপাটের দরজা ঝপাঝপ বন্ধ হইতেছে। ব্যাপার কি? দ্রুত ধাবমান এক পুলিসপুঙ্গব সংবাদ দিলেন, হল্লা আ গিয়া! সর্বনাশ! কি করিব ভাবিতেছি। ঘাড়ে দুই হাত চাপিয়া ঘাড় নোয়াইয়া এক ভদ্রলোককে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। আমরা স্থানীয় রিলিফ-সেণ্টারের লোক, সুতরাং আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে থামাইতে হইল। চারিদিক হইতে প্রশ্ন হইল, কোথায় লেগেছে মশাই? লাঠি, না ছুরি? শম্ভু-জগু

বেন্‌জিন্‌-টিংচারআইডিন আনিতে ছুটিল। ভদ্রলোক প্রথমটা পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে মশাই, দেখুন না বেটারা করেছে কি! তিনি ঘাড় হইতে হাত নামাইলেন।—সেলুনে ব'সে চুল কাটাচ্ছিলাম, কোথাও কিছু নেই, হল্লা উঠল। দোকান বন্ধ করবে ব'লে আমায় তাড়িয়ে দিলে মশাই। দেখিলাম, ভদ্রলোকের ঘাড়ের চুলের একটা দিক ক্লিপের সাহায্যে নির্মূল হইয়াছে, অন্যদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট কেশরাজি অপূর্ব দেখাইতেছে। আমরা সেই অবস্থাতেও হাসিবার খোরাক পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলাম।

—

কলিকাতার বাহিরে অবাধ হত্যার সংস্পর্শ হইতে যাঁহারা দূরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কলিকাতাবাসীর অবস্থা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। গত ৮ই জুলাই হইতে আজ পর্যন্ত কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য মার খাইয়া চলিয়াছে। ডাক ধর্মঘটের জের এখনও চলিতেছে, অর্থাৎ চিঠিপত্র ভি.পি. মনিঅর্ডার টেলিগ্রাম এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হয় নাই। নানা দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়া আমরা প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছি—মনের এমন দশা হইয়াছে যে, ডার্কে কবিতা ও গল্পের আমদানি অসহ্য ঠেকিতেছে; পরশুরামের "লম্বকর্ণ" গল্পের লাটুকোম্পানির মত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমরা মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে! চিঠির জবাব এবং পত্রিকা যথাসময়ে না পাইয়া অনেকে গালি দিতেছেন, অনেকে রসিকতা করিতেছেন। তাঁহারা হয়তো জানেনই না যে, আগষ্ট মাসের গোড়ায় চিঠি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া পৌঁছিতেছে। দিনের আলোকে সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইতেছে, সন্ধ্যার পর আপন চৌহদ্দির বাহির হওয়া অসম্ভব। মেশিনম্যান ও দপ্তরীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এখনও কঠিন. গাড়ি ও রিক্‌শাগুলি এপাড়া ওপাড়া করিতে ভয় পায় বলিয়া মাল আনয়ন ও প্রেরণ প্রায় বন্ধ। একটু হল্লা উঠিলেই বাজার-হাট বন্ধ হইয়া যায়। আর হল্লারও বিরাম নাই। এইরূপ অবস্থায় মফস্বলের পৃষ্ঠপোষকেরা আমাদের প্রতি কৃপা না করিলে আমরা মারা যাই। অবস্থা যে কবে স্বাভাবিক হইবে, স্বয়ং লর্ড ওয়াভেলও বলিতে পারেন না। যদি পূজার পর পর্যন্ত টিকিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা করিতেছি, কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই কার্তিকের পত্রিকা বাহির করিতে পারিব। যাঁহাদের চাঁদা এই আশ্বিনে ফুরাইল, তাঁহারা দয়া করিয়া মনিঅর্ডারযোগে আমাদের টাকা পাঠাইলে এই দুর্দিনে অনেক হাঙ্গামার হাত হইতে আমরা বাঁচিব। বর্তমানে ভি. পি.র অনেক গোলযোগ।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৫৩

অণিমা—শ্রীআরতি রায় ... ১০৫
অন্য কোনখানে—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ১৮০
অসহায় ... ৩০২
অহিংস বিপ্লব—শ্রীনির্মলকুমার বসু ... ৩১৫
আদর্শ পত্নী—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ... ৪৬
আমাদের ঝঞ্ঝাট—শ্রীউমা দেবী ... ১৯৮
ঋণ-ইজারা ও যুদ্ধজয়—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ... ৯
উপনিষদ—"বনফুল" ... ৩৪, ১৬৫
উপহার—"ববম" ... ২২৭
কাব্য ও অলঙ্কার—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ... ২৮৯
কুইট ইণ্ডিয়া—"ববম" ... ১২৫
গঠনকর্মপদ্ধতি—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ... ১৬৮
গণ-সংযোগ—শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ... ১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪১
চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুনীলকুমার পাল ... ৮৯
চিন্তাধারা—অনাথগোপাল সেন ... ২৮
তুমি ... ১৪
দীর্ঘসূত্রীর প্রার্থনা ... ১৪৫
দেশ-নায়ক—রবীন্দ্রনাথ ... ৭৯
নেলীর বাবার ডায়েরি—শ্রীসুকুমার রায় ... ৪৯০
পঞ্চকন্যা—শ্রীমতী বাণী রায় ... ৪৭৫
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, ১২৬, ২১৮, ২৪৯, ৩৫৩, ৪৪৮

পলাতক—শ্রীশীতাংশু মৈত্র ... ৪০
পূরবী—শ্রীউমা দেবী ... ৯৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭৯
বন্ধন-মুক্তি ... ৩৬
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—"টেকচাঁদ" ... ৫
বিবর্তন—শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮৪
বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট—"শ্রীবিরূপাক্ষ" ৩৭, ১০৭, ২৭৫, ৩৭৮, ৪৭১
ভ্রষ্ট লগ্ন—শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা ... ৩৬৯
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ১৭, ১১১, ২০৩, ২৫৯, ৩৩৬, ৪৫৬
মানুষের প্রকৃতি ও শাস্তি—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র ... ২৯৮
মৃগ-তৃষ্ণিকা—শ্রীউমা দেবী ... ৩৬৬
রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা—শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় ... ২৩৯
রাম গল্প—"বনফুল" ... ৩৮০
রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল ১৯১, ২৫৭, ৩৫০, ৪৫৪
শক্তি-পূজা ... ৩৯১
শব্দের অপপ্রয়োগ—শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ ... ৮৭
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ১৫৯, ২৪৮, ৩৬২, ৪৮০
সংবাদ-সাহিত্য ৬৬, ১৪৬, ২২৯, ৩০৩, ৩৮২, ৫০১
সত্যাগ্রহ ... ৩৭৭
সমাধান—শ্রীঅমলা দেবী ... ৪০৭
সূর্য-প্রণাম—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ৮২
ষ্টিল গোয়িং— ... ৬৫
স্মৃতি ... ৩৯
হুঁশিয়ার—শ্রীসুবোধ রায় ... ৯৭
৯ই আগস্ট ... ৩৩৫

নূতন
ভাব - ব্যঞ্জনা

অলঙ্কারের রূপ-পরিকল্পনার নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদের সুদক্ষশিল্পীরা সব সময়েই সচেতন, তাই তাদের আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি আর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা নারীর আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ রত্ন-সম্পদ অলঙ্কারকে আরও মূল্যবান ক'রে তোলে।

আমাদের শো-রুমে একবার এসে সুদক্ষ-শিল্পীর তৈরী আধুনিকতম অলঙ্কার-সম্ভার একবার দেখুন।

আপনার নির্ব্বাচনের জন্যে বহু ও বিচিত্র অলঙ্কার-সম্ভার সব সময়েই মজুত থাকে, তা ছাড়া ব্যক্তিগত রুচিমাফিক গহনাও আমরা নিখুঁতভাবে তৈরী করে দিই।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী

১২৯, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন বি,বি, ১৭৬১